চিঠিপত্র

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩। প্রতিমা দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৪। মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

পথে ও পথের প্রান্তে। রানী মহলানবীশকে লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী। শ্রীমতী রানু দেবীকে লিখিত

সপ্তম খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিঠিপত্র ॥ সপ্তম খণ্ড

প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭

সংস্করণ : ২২ শ্রাবণ ১৩৯৯

পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত

© বিশ্বভারতী

প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ

বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীজয়ন্ত বাকৃচি

পি. এম. বাকৃচি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড

১৯ গুলু ওস্তাগর লেন। কলিকাতা ৬

সূচীপত্র

পাণ্ডুলিপিচিত্র

কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত

ওঁ

কল্যাণীয়াসু—

তোমাকে বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানাইবার জন্য আমার মন উৎসুক হইল— সেইজন্য যদি চ তোমার নাম জানিনা মা, তথাপি আশাকরি, যে ভগবানের নিকট তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় তবে এ পত্র তোমার হস্তে পড়িবে।

ভগবান অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই আছেন— তাঁহারই আলোক আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে তাঁহারই বায়ু প্রতি মুহূর্ত্তে নিশ্বাসরূপে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতেছ; তাঁহারই সঙ্গে তোমার একান্ত যোগ ত এক মুহূর্ত্তকালও বিচ্ছিন্ন নাই— যিনি এমন করিয়া ধরা দিয়াছেন সেই অন্তর্যামীকে যে কেমন করিয়া পাওয়া যায় তাহা কেহ বলিতে পারেন না। তিনি কাহার কাছে কখন কেমন করিয়া যে দেখা দেন তাহা তিনিই জানেন— কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ জানিয়ো তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই এবং করিবেন না। উপনিষদে ঋষি একটি কথা বলিয়াছেন— স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা— ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি আমাদের বন্ধু— কারণ বন্ধুই যদি না হইবেন তবে সৃষ্টি করিলেন কেন? তিনি এই নিমেষেই আমাদিগকে লুপ্ত করিতে পারেন। সেই যে আমাদের জনিতা অর্থাৎ পিতা এবং বন্ধু— স বিধাতা— তিনিই আমাদের

বিধাতা— অর্থাৎ আমাদের জীবনের প্রত্যেক সুখ দুঃখ তাঁহারই বিধানে ঘটিতেছে। যখন একথা নিশ্চয় যে আমার বন্ধুর বিধান ছাড়া জগতে আর কোনো বিধান নাই তখন জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই আমি ধন্য— সুখ দুঃখ আমার সকলি শিরোধার্য্য— সকল কর্ম্মে সকল স্থানেই তিনি আমাকে আমার সার্থকতার দিকেই লইয়া যাইতেছেন ইহাতে কোনো সন্দেহই নাই। আমিই কি কেবল তাঁহাকে চাই তিনি কি আমাকে চান না? যদি না চাহিবেন তবে আমার মত ক্ষুদ্রটুকুর জন্য জগৎ জুড়িয়া এত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন কেন? শুধু কেবল আমিই যদি তাঁহাকে চাহিতাম তবে কোনকালে তাঁহাকে পাইতাম না— কিন্তু তিনি যখন আমাকে চান তখন আর ভাবনা কিসের? তাঁহার কাল অনন্ত তাঁহার পথ বিচিত্র এবং এই ক্ষুদ্র জীবনেই আমাদের শেষ নহে। অতএব প্রত্যহই তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাক— ইহা নিশ্চয় মনে রাখ তিনি তোমাকে এক মুহূর্ত্ত ছাড়েন নাই।

আমি গুরুর ন্যায় উপদেশ দিবার অধিকারী নহি— আমি হিতৈষীর ন্যায় তোমাকে পরামর্শ দিতেছি যে জীবনে প্রত্যহ একটা কোনো মঙ্গল কর্ম্ম করিয়ো যাহা নিতান্তই তাঁহারই উদ্দেশে করা হইবে। যাহার জন্য যশ চাহিবেনা; যাহার প্রতিদান পাইবেনা, যাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে গোপনে সম্পন্ন করিবে। তখন মনে মনে এই বলিয়ো, "ভগবান এই কাজটি সম্পূর্ণ তোমাকেই দিলাম— ইহা তুমিই জানিলে আর আমিই জানিলাম।" যদিও সংসারের সকল কাজই তাঁহারই কাজ, কারণ এ সংসার তাঁহারই সংসার—

তথাপি সে সকল কাজের সঙ্গে আমাদের নানা স্বার্থ নানা বাধ্য-বাধকতা জড়িত থাকে। দিনের মধ্যে অন্তত একটা কোনো কাজ যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক, বাধ্য না হইয়া, সমস্ত ফলকামনা নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পার তবে সেই কর্ম্মের মধ্যে তোমার পূজা সমাধা হইবে তোমার জীবন কৃতার্থ হইবে। ভগবানের কাজে ছোট বড় নাই, তিনি ভাব গ্রহণ করেন— তুমি তোমার সাধ্য বুঝিয়া সামান্য যাহা কিছু পার তাহাই করিয়ো। কর্ম্মে ভগবানের যে পূজা তাহাই শ্রেষ্ঠ।

মাতঃ আমার এই আশীর্ব্বাদ পত্র তোমার কোনো কাজে লাগিবে কিনা জানিনা কারণ, আশীর্ব্বাদ সার্থকভাবে করিবার শক্তি সকলের নাই— আমিও ফলকামনা নিরপেক্ষ হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ করিয়া এই পত্রখানি তোমাকে প্রেরণ করিলাম— তাঁহারই জয় হউক্।

২

২২ অক্টোবর ১৯০৩

ওঁ

"শান্তিনিকেতন"
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

কিছুকাল হইতে আমার শরীর অসুস্থ হইবার অনেক কারণ ঘটিয়াছে— আশা করিতেছি আবার শীঘ্র বললাভ করিয়া কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠিব।

আমার কোন কোন রচনা তোমাকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়াছে শুনিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি। নরনারীর চিত্তে ভগবানের অমৃতধারা প্রবাহিত করাইয়া দেওয়া— কোন লেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না।

যে সংসারে তুমি প্রবেশ করিয়াছ সেই সংসারকে তুমি ধৈর্য্যে ক্ষমায়, মঙ্গলে ও মাধুর্য্যে অভিষিক্ত কর। এই কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিয়ো, ভগবান আমাদের সেবার অপেক্ষা রাখেন না— মানুষের সেবার মধ্যেই তাঁহার সেবা। তিনিই স্বামিরূপে আমাদের প্রীতি, পুত্ররূপে আমাদের স্নেহ, দীনরূপে আমাদের দয়া গ্রহণ করেন। যাহার সেবা করিবে মঙ্গল করিবে পূজারূপে তাহা ঈশ্বরের চরণেই পৌঁছিবে। শোকদুঃখকে তাঁহার হস্তের দান বলিয়া নতশিরে ধারণ করিলে জীবনের সমস্ত বেদনাও সার্থক হইয়া উঠিবে। সংসারকেই ঈশ্বরের পবিত্র পাদপীঠ জানিয়া সেই সংসার-মন্দিরেই তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিবে— এবং প্রসন্নচিত্তে

প্রফুল্লমুখে প্রতিদিন সংসারের কল্যাণসাধনদ্বারা ভগবানের প্রত্যক্ষ সেবা করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিবে।

সাকার নিরাকার একটা কথার কথামাত্র। ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুইই। শুধু ঈশ্বর কেন আমরা প্রত্যেকেই সাকারও বটে নিরাকারও বটে। আমি এ সকল মতামত লইয়া বাদবিবাদ করিতে চাহি না। তাহাকে রূপে এবং ভাবে, আকারে এবং নিরাকারে কর্ম্মে এবং প্রেমে সকল রকমেই ভজনা করিতে হইবে। আকার ত আমাদের রচনা নহে, আকার ত তাঁহারই।

তোমার প্রতি আমার এই আশীর্ব্বাদ যে, ভগবানের প্রতি ভক্তি তোমার চিত্তে যে অমৃতরস বর্ষণ করিবে তাহা যেন নিয়ত তোমার চারিদিকের সংসারকে মধুময় করিয়া রাখে। ইতি ৫ই কার্ত্তিক ১৩১০

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

৯ মে ১৯০৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।

সংসারক্লিষ্ট হৃদয়ের শান্তির জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। ইহা নিশ্চয় জানিয়ো সুখ দুঃখ বাহিরের ঘটনার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে না— বাহিরের ঘটনা অতি ক্ষুদ্র উপলক্ষ্য মাত্র— ঈশ্বর যাহার অন্তঃকরণে সুখী হইবার শক্তি দেন সেই জীবন হইতে জগৎ হইতে সুখ লাভ করিতে পারে। আমি অনেক লোককে জানি যাহারা সুখকর সমস্ত উপকরণদ্বারা বেষ্টিত কিন্তু চিরজীবন সুখ অনুভব করিল না। দূর হইতে উপদেশ দেওয়া সহজ— কিন্তু আমি জানি অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে জীবন যখন সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে তখন জগৎ হইতে রস আকর্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু জীবন যখন পাইয়াছ, বাঁচিতেই যখন হইবে তখন নিজের সঙ্কীর্ণ অবস্থার ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশের মধ্যে মাথা তুলিতেই হইবে— আলো পাইতেই হইবে, মুক্তবায়ুর মধ্যে আত্মাকে বিস্তৃত করিতেই হইবে। বাহিরের প্রতিকূলতা যতই কঠিন অন্তরের শক্তিকে ততই প্রাণপণ বলে উদ্বোধিত করিতে হইবে। তোমার চারিদিকে যেটুকু লেশমাত্র সুখ যেটুকু কণামাত্র আনন্দ আছে তাহাকেই মনের সম্মুখে রাখ— বল "আনন্দং পরমানন্দম্।" পরাভূত হইয়ো না— দুঃখকে সর্ব্বদা দুঃখ

বলিয়া স্বীকার করিতে থাকিলেই তাহার জাল ছিন্ন করা কঠিন হইয়া উঠে— সমস্ত দুঃখ দৈন্য অভাবের চেয়ে যে আমি বড় ইহা বারম্বার মনকে বুঝাইয়ো। আমি যে প্রতি মুহূর্ত্তে বাঁচিয়া আছি ইহার জন্য ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ব্যয় হইতেছে, সেই শক্তির কণামাত্র হ্রাস হইলেই আমি তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম; এই যে এতবড় শক্তির দ্বারা বিধৃত আমি, এই যে এত বড় প্রেমের দ্বারা পরিবেষ্টিত আমি— আমার খেদ কি লইয়া? কে আমাকে কি বলিল— কে আমাকে কি বুঝিল ইহাই কি জগতে সকলের চেয়ে বড়? আমার যে এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টিশক্তি একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার —আমার যে একবার মাত্র নিশ্বাস লইবার ক্ষমতা একটি আশ্চর্য্য ঘটনা— আমার মত এই পরমাশ্চর্য্য সত্তাকে কোনো দুঃখই মলিন করিতে এবং কোনো পীড়নই ক্ষুদ্র করিতে পারে না। মন যখনই অপ্রসন্ন হইতে চাহিবে তখনি তাহাকে তোমার সমস্ত শক্তিতে উর্দ্ধের দিকে টানিয়া তুলিবে, বলিবে—

সুখং বা যদিবা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ম্.
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত
হৃদয়েনাপরাজিতা—

সুখই হউক্ দুঃখই হউক্, প্রিয়ই হউক্ অপ্রিয়ই হউক্ যাহাই প্রাপ্ত হইবে তাহাকেই অপরাজিত চিত্তে উপাসনা করিবে। ইতি ২৬শে বৈশাখ ১৩১৩

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ভবানীপুর

১৭ এপ্রিল ১৯০৭*

ওঁ

মাতঃ

ঈশ্বর যদি আমার মধ্যে আশীর্ব্বাদ করিবার যথার্থ শক্তি দিতেন তবে আমার আন্তরিক মঙ্গল কামনা তোমার জীবনকে এই মুহূর্ত্তেই নবপ্রভাতের আলোকের ন্যায় স্পর্শ করিত। যে জীবন শান্তির জন্য প্রার্থী, পরিপূর্ণতার জন্য ব্যাকুল, উপর হইতে তাহার প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে পারি ঈশ্বর যদি কোনোদিন আমাকে এমন অধিকার দান করেন তবে আমি ধন্য হইব। আমিও যাত্রী— তীর্থ কতদূরে তাহা তীর্থের অধীশ্বরই জানেন, দুর্গম পথের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করিয়া আমাকে চলিতে হইবে,— আমারই কি আনন্দের সম্বল জমিয়াছে? নববর্ষের দিনে আমি ঈশ্বরের কাছে এই কথাই জানাইয়াছি যে সুখে দুঃখে আমার জীবনকে লইয়া প্রতিদিনই তুমি ত মঙ্গলসঙ্গীত রচনা করিয়া চলিয়াছই— আমার প্রার্থনা কেবল এই যে তোমার সেই মঙ্গলে আমারও অন্তঃকরণ যেন যোগ দিয়া চলে— আমি যেন তোমার হাতের সমস্ত দানকেই মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি। ঈশ্বর না জানি আরো কি দাবী করিবেন সে কথা মনে করিতে ভয়ও হয়, সেটুকু দুর্ব্বলতা ছাড়িতে পারি নাই— কিন্তু তবু আমার মন যেন একান্তভাবে বলিতে পারে, আমার কাছে তোমার যত দাবী

তুমি সমস্তই মিটাইয়া লও— তুমি কিছুই ছাড়িয়ো না— আমি সহিতে পারিব— আমি আনন্দিত হইব। ঈশ্বর তাঁহার পরম দানগুলিকে দুঃখের ভিতর দিয়াই সম্পূর্ণ করেন— তিনি বেদনার মধ্য দিয়া জননীকে সন্তান দেন— সেই বেদনার মূল্যেই সন্তান জননীর এত অত্যন্তই আপন। সেই কথা মনে রাখিয়া, যখন ঈশ্বরের কাছে সত্য চাই, আলোক চাই, অমৃত চাই তখন অনেক বেদনা অনেক ত্যাগের জন্য নিজেকে সবলে প্রস্তুত করিতে হইবে। মা, ঈশ্বর যদি তোমাকে বেদনা দেন তবে নিজের দোষে সেই বেদনাকে ব্যর্থ করিয়ো না— তাহাকে সফল করিবার জন্য সমস্ত হৃদয়মনকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া জাগ্রত হও। সংসারের সমস্ত আচ্ছাদন আবরণের উর্দ্ধে জাগ্রত হও। মনে মনে বল, আমি দুর্ব্বল নই— বল আমি পরাস্ত হইব না— বল আমার ক্ষণিক জীবনের অন্তরালে অনন্ত জীবনের সম্বল রহিয়াছে, এ জীবনের সমস্ত জালই একে একে কাটিয়া যাইবেই কিন্তু সে সম্বল কোনোকালেই ফুরাইবে না, তাহা সূর্য্যের আলোর মত অক্ষয়। ঈশ্বর তোমার মধ্যে যে মহিমা স্থাপন করিয়াছেন তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া দেখ— নিজেকে দীন বলিয়া দুর্ব্বল বলিয়া ছোট বলিয়া অপমান করিয়োনা, কারণ, তাহা কখনই সত্য নহে। তোমার অন্তরাত্মার মধ্যেই বিজয়লক্ষ্মী বসিয়া আছেন তাঁহাকে দেখিলেই তোমার আর কোনো ভয় থাকিবে না— তুমি যে কি মহৎ তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিবে— তুমি ঈশ্বরের আনন্দের ধন— এই বার্ত্তা নিজেকে শুনাইয়া দাও! যাহাই ঘটুক, ঘটনা সমস্তই তোমার

আত্মার কাছে অতি তুচ্ছ— তোমার চেয়ে বড় কেহই নাই সেই জন্যই সকলের মধ্যেই তুমিও আছ। তোমার কিছুতে ভয় নাই, কিছুতেই ক্ষতি নাই, ঈশ্বর তোমার।

৫

৫ ডিসেম্বর ১৯০৭

ওঁ কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, ঈশ্বর আমাকে বেদনা দিয়াছেন কিন্তু তিনি ত আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই— তিনি হরণও করিয়াছেন পূরণও করিবেন। আমি শোক করিব না— আমার জন্যও শোক করিয়ো না।

আমার শরীর ভালই আছে। আমার কন্যাদুইটিকে লইয়া কিছু দিনের জন্য শিলাইদহে পদ্মার বক্ষে বাস করিতে প্রস্তুত হইতেছি।

ঈশ্বর তোমাকে মঙ্গলে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করুন এই আমার অন্তরের কামনা। ইতি ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৪

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

[জুন ?, ১৯০৮]

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, তুমি যে মেয়েটির কথা লিখিয়াছ তাহাকে আমি আশ্রয় দিতে পারি। যদি তুমি তাহাকে স্থিরবুদ্ধি ও সৎস্বভাব বলিয়া জান তবে তাহাকে আমার কাছে পাঠাইতে পার। এখানে আমার মেয়েরা আছে, তাহার কোনো কষ্ট হইবে না। এমন কি, আমার বড় মেয়ের কাছে তাহার ইংরেজি পড়ার অনেকটা সাহায্য হইতে পারে। ইন্দু যদি ছোট ছেলে পড়াইবার ভার লইতে সক্ষম হয় তবে তাহাকে রীতিমত কাজে নিযুক্ত করিয়া দিতে পারিব— তদ্দ্বারা তাহার ক্রমশঃ কিছু সঞ্চয়ের সুযোগ হইতেও পারে। এ সম্বন্ধে, তাহার পরিচয় না পাইয়া কোনো কথা বলিতে পারি না।

এই বৎসরের আরম্ভ হইতেই বাড়িতে ব্যামো লইয়া আমাকে কেবলি উদ্বেগ ভোগ করিতে হইয়াছে। আমার বর্ত্তমান দুই কন্যার স্বামীই বিলাতে— মেয়েরা আমার কাছে আছে। আজ পর্য্যন্ত তাহাদের শরীর সুস্থ হইয়া উঠে নাই— এই কারণে তাহাদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় আমাকে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে। ইহার উপরে অন্যান্য নানা কাজের ভার আমার উপর থাকাতে আমাকে কিছু ক্লিষ্ট করিয়াছে।

রাজা প্রজা নামক আমার বই নূতন বাহির হইয়াছে হাতে

আসিয়া পৌঁছিলেই তোমাকে একখণ্ড পাঠাইয়া দিব। গদ্য-গ্রন্থাবলীর অন্য বইগুলিও তুমি শীঘ্র পাইবে।

ঈশ্বর তোমার চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিকার করুন এই আমার আশীর্ব্বাদ।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

২২ জুলাই ১৯০৮

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি ও সেই সঙ্গে ইন্দু তোমাকে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছে তাহা পাইলাম।

এ পত্র হইতে ঠিক তাহার পরিচয় হয় না। তাহার বয়স অল্প, এবং তাহার অবস্থাও সঙ্কীর্ণ; এমন স্থলে নিজের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে তাহার কল্পনা যে সর্ব্বদাই উত্তেজিত হইয়া থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। বয়স হইলে আশা করি এটুকু বুঝিতে পারিবে যে, নিজেকে দুঃখী বলিয়া চিন্তা করিতে থাকিলে দুঃখের কালিমা বাড়িয়াই উঠে। আমরা চিন্তা দ্বারা নিজেকে অনেক পরিমাণে সৃষ্টি করিয়া থাকি— আমাদের সেই স্বরচিত সৃষ্টি সকল সময়ে মঙ্গলকর হয় না। নিজের সুখ দুঃখ ও অবস্থার প্রতি সর্ব্বদাই করুণদৃষ্টি নিক্ষেপ করা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যজনক। উহাতে নিজেকে প্রশ্রয় দিয়া কেবলি দুর্ব্বল করিয়া তোলাই হয়। নিজেকে ভুলিবার সাধনাই জীবনের প্রধান সাধনা— এবং আমার যেটুকু নাই তাহার চেয়ে আমার যাহা আছে তাহা যে অনেক বেশি এই কথা স্বীকার করিতে পারাই সত্যকে স্বীকার করা।

কিন্তু নিজের সম্বন্ধে এই দুর্ব্বলতা ন্যূনাধিক পরিমাণে আমাদের সকলেই আছে অতএব বালিকার সম্বন্ধে এই ত্রুটি

লইয়া অধিক কিছু বলিলে কঠোরতা করা হয়। কিন্তু আমার নিজের মেয়েকেও আমি এই আত্মধ্যান এবং আত্মকরুণার অনিষ্টকরতা সম্বন্ধে সচেতন করিতে সঙ্কোচ করিনা অতএব আমার বাক্যগুলিকে অনাবশ্যক নির্ম্মম বলিয়া মনে করিও না।

আমি সম্ভবত ভাদ্রমাসের আরম্ভে অথবা মাঝামাঝি বোলপুরে ফিরিব। সেই সময়ে ইন্দুকে বোলপুরের কাজে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিব। সে যদি উপযুক্ত কাজের মধ্যে ব্যাপৃত হইতে পারে তাহা হইলে নিঃসন্দেহই নিজেকে দীনাত্মা বলিয়া মনে করিবে না— প্রত্যেক মানুষকেই ঈশ্বর যে মাহাত্ম্য দান করিয়াছেন তাহা উপলব্ধি করিয়া সে নিজের পীড়ন হইতে নিজে মুক্ত হইতে পারিবে। বোলপুরের কাজে ইন্দু যে বিশেষ বল এবং শান্তি পাইবে আমার তাহাতে সন্দেহ নাই।

তোমাকে আমার গ্রন্থাবলীর যে কয়খানি বই বাহির হইয়াছে পাঠাইবার জন্য প্রকাশককে লিখিয়া দিলাম। তোমার ভবানী-পুরের ঠিকানাতেই যাইবে। একখানি "রাজাপ্রজা" আজ এখান হইতে পাঠাইলাম।

কাব্যগ্রন্থাবলী কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া পাঠাইব।

ঈশ্বর তোমার সমস্ত অন্তঃকরণকে অধিকার করুন। ইতি ৭ই শ্রাবণ ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ মেয়েরা এখন ভালই আছে। তাহারা বোলপুর বিদ্যালয়ে

ছোট ছেলেদের তত্ত্বাবধান ও অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছে। কয়েকদিন হইল আমার ছোট মেয়ের শ্বশুর মারা যাওয়াতে উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। রথীর খবর নিয়মিত পাইয়া থাকি। তাহার পড়াশোনায় বেশ উন্নতি হইতেছে।

৮

২৪ অক্টোবর ১৯০৮

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, তোমার পত্র কয়দিন হইল পাইয়াছি। এবার শিলাই-দহে আসিয়া অবধি শরীর অসুস্থ যাইতেছে।

বোলপুরে আমি যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছি তাহার শিশু-বিভাগে আমি স্ত্রীলোক কর্ত্রী রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। একটি বিধবা ব্রাহ্ম বালিকা আমার কাছে থাকিয়া এই কার্য্যে যোগ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন— তিনি আজই আমার এখানে আসিতেছেন। তিনি আমার কন্যার ন্যায় কন্যাদের সঙ্গেই থাকিবেন।

ইন্দু যদি এইরূপ কার্য্যে যোগ দিবার জন্য যথার্থ ই মনকে প্রস্তুত করিতে পারেন তাহা হইলে তিনিও ইঁহার এক সঙ্গে থাকিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু এ সকল কাজে তাঁর মন বসিবে কি না— তিনি ইহাতে পরিতৃপ্ত হইবেন কি না তাহা ভাবিবার বিষয়। বিধবার পক্ষে যাহা উপযুক্ত, কুমারীর পক্ষে তাহা নাও হইতে পারে। সমস্তই ইন্দুর প্রকৃতি ও মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমার ঘরে গৃহিণী নাই, আমার মেয়েরা অল্পবয়স্কা— সুতরাং তুমি যদি মনে কর ইন্দু নিজের দায়িত্ব নিজে বহন করিবার উপযুক্ত, এবং বোলপুরের শিশু পাঠন

ও পালন কার্য্যে অনিচ্ছুক নহেন তাহা হইলে তাঁহাকে এই কাজে নিযুক্ত করিলে তিনি আত্মীয়ের অভাব ও কর্ম্মের অভাব অনুভব করিবেন না— তাঁহার কর্ম্মশিক্ষা ও মনের উন্নতিও হইতে পারিবে। আমরা অগ্রহায়ণের আরম্ভে বিদ্যালয়ে যাইব— যদি কোনো ছুটি বা অন্য উপলক্ষ্যে ইন্দু বোলপুরে গিয়া সেখানকার কাজকর্ম্ম দেখিয়া মন স্থির করিতে পারেন তাহা হইলে সেরূপ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

কিন্তু আমাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বিশেষ শ্রদ্ধা করেন না— তাঁহারা আমাকে পূরা ব্রাহ্ম বলিয়াই গণ্য করেননা, অতএব ইন্দুর হিতৈষীরা যে এই প্রস্তাবে উৎসাহ বোধ করিবেন এরূপ আশা করি না। ইতি ৮ই কার্ত্তিক ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

২৮ এপ্রিল ১৯০৯

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

অনেকদিন পরে তোমার সংবাদ পাইয়া নিরুদ্বিগ্ন হইলাম। তুমি আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।

আমার এখানে একটি ছোটখাট বালিকা বিদ্যালয়ও জমিয়া উঠিতেছে। এখন ৬টি মেয়ে পড়ে— ছুটির পরে আষাঢ় মাসে আরো কয়টি আসিবে কথা আছে। মোহিত বাবুর স্ত্রী এবং আর দুই একটি বয়স্কা মহিলা এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিবেন। ইঁহাদের মধ্যে ইন্দুর ঠিক স্থান হইতে পারিত কি না সন্দেহ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চিত্ত আমার প্রতি অনুকূল নহে। এইজন্য তুমি যখন ইন্দুকে এখানে পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলে তখনি ইহার সম্ভবপরতা সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ ছিল। তুমি এ বিষয়ে আর কোনোরূপ চেষ্টা করিয়ো না। কারণ, দায়িত্বভার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত না হইলে তাহা বহন করা কঠিন হয়।

আমার শরীর বিশেষ সুস্থ নহে। বিদ্যালয়ের ছুটি হইয়াছে। স্থির ছিল আমার কন্যাকে লইয়া পশ্চিমে যাইব। ইতিমধ্যে সে জ্বরে পড়িয়াছে— সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলে আমি যাত্রা করিতে পারিবনা।

তুমি আমার গ্রন্থাবলীর কোন্ খণ্ড পর্য্যন্ত পাইয়াছ জানিতে পারিলে বাকি গুলি পাঠাইতে বলিয়া দিব।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ১৫ই বৈশাখ ১৩১৬

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

১২ জুলাই ১৯০৯

ওঁ

শিলাইদহ

নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ আমার শরীর বিশেষ ভাল ছিলনা। বিদ্যালয় লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। বোলপুরে বালক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়াছি। গ্রীষ্মাবকাশের পর তাহার সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়াতে আজ শিলাইদহে আসিয়া পদ্মার উপরে আশ্রয় লইয়াছি।

তুমি নানাবিধ সাংসারিক দুশ্চিন্তাজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছ শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। সমস্ত উৎকণ্ঠার মধ্যে তুমি চিত্তকে তাঁহার অসীম মাধুর্য্যে নিবিষ্ট করিতে পারিবে আমি এই আশা করিতেছি। সংসারের অভিঘাতে যিনি তোমাকে দোলায়িত করিতেছেন তিনিই তোমার অন্তরে থাকিয়া তোমাকে নিবিড় এবং নিশ্চল আশ্রয় দান করুন এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ২৮শে আষাঢ় ১৩১৬

আশীর্ব্বাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

২৬ জুলাই ১৯০৯

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

উপনিষদে আছে— ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ অর্থাৎ— জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করিয়া জানিবে। আমরা তাহাই করি না বলিয়া সংসার একেবারেই আমাদের মর্ম্মস্থানের উপরে চাপিয়া পড়িয়া আমাদিগকে বেদনা দেয়।

আমাদের অন্তর বাহির সমস্তই যখন তাঁহার দ্বারা আবৃত বলিয়া জানি তখন মাঝখানে তিনি থাকেন— বোঝা একেবারে আমাদের মাথায় চাপিয়া পড়েনা আঘাত একেবারে আমাদের বুকে আসিয়া বাজে না। সংসারের সমস্ত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও তাঁহাকে চারিদিকে আবির্ভূত বলিয়া অনুভব করিবার সাধনা করিলে তাঁহার সম্মুখে আর সমস্তই মাথা নত করে— যাহা ছোট তাহা ছোট হইয়াই থাকে, যাহা যথার্থ অন্তরের সামগ্রী নহে তাহা বাহিরেই পড়িয়া থাকে। জগতে যিনি সকলের বড় তিনিই আমাদের জীবনে সকলের চেয়ে বড় স্থান অধিকার করিয়া থাকুন— তাঁহাকেই সংসারের চেয়ে ছোট করিয়া ফেলি বলিয়া এত দুঃখ পাই।

"শান্তিনিকেতন" নামক আমার ধর্ম্মোপদেশের বইগুলি

তোমাকে শীঘ্রই পাঠাইয়া দিব। এখানে আমার কাছে নাই— দুই চারি দিনের মধ্যে পাইব তখন তোমাকে পাঠাইতে পারিব।

এখানে আসিয়া আমার শরীর পূর্ব্বের চেয়ে একটু ভাল আছে। ইতি ১০ই শ্রাবণ ১৩১৬

আশীর্ব্বাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

২২ নভেম্বর ১৯০৯

ওঁ

পতিসর

আত্রাই

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ আমার শরীরের সম্বন্ধে মনে কোনো উৎকণ্ঠা রাখিও না—মোটের উপর আমি ভালই আছি।

আজ কিছুদিন নানা নদীর মধ্য দিয়া বোটে করিয়া ভ্রমণ করিতেছি। অনেকদিন পরে কাল এখানকার কাছারিতে আসিয়া পৌঁছিয়া তোমার পত্র পাইলাম।

শান্তিনিকেতন পড়িয়া তুমি কিছু উপকার বোধ করিতেছ ইহাতে আমি আনন্দিত হইলাম। জীবনে এমন কোনো সিদ্ধিলাভ করি নাই যাহাতে পরম সত্যকে তোমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করিয়া দিতে পারি—তবে যদি ঈশ্বর আমাকে ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা দিয়া থাকেন, এবং সেই উপায়ে তিনি আমাকে দিয়া যদি তিনি তাঁহার কোনো কাজ উদ্ধার করিয়া লন তবে আমার এই পৃথিবীতে জন্মলাভ সার্থক হইবে।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

২৬ নভেম্বর ১৯০৯

ওঁ আত্রাই নদী

কল্যাণীয়াসু—

মাতঃ আমার চিঠি সম্ভবত তুমি পূর্ব্বেই পাইয়াছ। নানা কারণে তোমার পূর্ব্বপত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল সেজন্য উদ্বিগ্ন হইয়ো না। আমি এখনো বোটে করিয়া নদীপথে ভ্রমণ করিতেছি। ১৫ই অগ্রহায়ণের পূর্ব্বেই কলিকাতায় ফিরিবার কথা।

ঈশ্বর তোমার অন্তরে প্রত্যক্ষ হইয়া তোমার জীবনকে পরিপূর্ণ করুন। ইতি ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

২৪ এপ্রিল ১৯১০

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ মাঝে আমার শরীর ভাল ছিলনা— এখন মোটের উপর ভালই চলিতেছে। এখন গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হইবে এইবার এখানকার বিদ্যালয়ের কাজ হইতে মাস দেড়েকের মত ছুটি পাইব —মনে করিতেছি কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাইব।

বর্ষারম্ভের দিনে বিদ্যালয়ে আমাদের উপাসনা ছিল— তাহার পর হইতে নানা ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল সেই কারণেই তোমার শেষ চিঠির উত্তর দিতে পারি নাই।

কলিকাতায় যখন যাইব তোমাকে বই পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।

আমি মনের আনন্দে আছি জানিবে— আমার জন্য কোনো উদ্বেগ রাখিবেনা। ইতি ১১ই বৈশাখ ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

৪ জুলাই ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ তার উত্তর দিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করচি।

একটি কথা তুমি নিশ্চয় জেনো ব্রাহ্ম পরিবারে যদিও আমার জন্ম তবু ঈশ্বর উপাসনা সম্বন্ধে আমার মন কোনো সংস্কারে আবদ্ধ হয় নি। তার একটা কারণ, অতি শিশুকালেই আমার মধ্যে কবি প্রকৃতি অত্যন্ত প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল— আমি আমার কল্পনা নিয়েই সর্ব্বদা ভোর হয়ে ছিলুম— ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে কে কি বলে বাল্যকালে তা আমার কানেও যায় নি।

তার পরে আমার বয়স যখন ১৩।১৪ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি —তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশ লাভ করেছিলুম।

এই বৈষ্ণবকাব্য এবং চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি কাব্য অবলম্বন করে চৈতন্যের জীবনী আমি অনেকবয়স পর্য্যন্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এমন কি, আমাদের সমাজের ধর্ম্মালোচনার সঙ্গে আমি বিশেষ যুক্ত ছিলুম না— সম্পূর্ণই উদাসীন ছিলুম। তার পরে আমার স্বদেশ অভিমানও বাল্যকাল

থেকে অত্যন্ত প্রবল। সেজন্যও, যা কিছু আমাদের দেশের তাকে ভালভাবে গ্রহণ করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলুম— বরঞ্চ প্রতিকূল কিছু শুনলে জোর করে নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও তার প্রতিবাদ করা আমার স্বভাব ছিল।

এই সকল নানাকারণে ব্রাহ্মসমাজ আমাকে ঠিক ব্রাহ্ম বলে গ্রহণ করেন নি এবং আমাকে তাঁরা বিশেষ অনুকূল দৃষ্টিতে কোনোদিন দেখেন নি।

এই ভূমিকাটুকু আবশ্যক। কারণ, তোমার এটুকু জানা আবশ্যক কোনো সাম্প্রদায়িক সংস্কারবশত অন্ধভাবে আমি কোনো কথা বলচিনে। যখন থেকে আমি আমার জীবনের গভীরতম প্রয়োজনে আমার অন্তরতম প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যাকুলতার প্রেরণায় সাধনার পথে প্রবৃত্ত হলুম তখন থেকে আমার পক্ষে যা বাধা তা বর্জ্জন করতেই হয়েছে এবং যা অনুকূল তাই গ্রহণ করেছি।

অর্থাৎ যখন মানুষের সত্যকে না হলে নিতান্ত চলেনা তখন সে দেশের খাতিরে বা সংস্কারের টানে কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে নিজেকে আর ভুলিয়ে বেড়াতে কোনোমতে পারে না— এমন কি, সে রকম ফাঁকিতে তার অত্যন্ত একটা ধিক্কার বোধ হয়। যখন আমরা সত্যই ঈশ্বরকে চাই তখন আমরা নিজের বা অন্যের সঙ্গে লেশমাত্র চালাকি করতে পারি নে।

এই রকম অবস্থায় আমি আমাদের দেশপ্রচলিত দেবপূজার প্রণালীকে কেন যে সমস্ত মন থেকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি তা

নিশ্চয়ই আমার সমস্ত শান্তিনিকেতনের লেখাগুলির ভিতরে কতকটা প্রচ্ছন্ন ও কতকটা প্রকাশ্য ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

সে সমস্ত এই চিঠির মধ্যে ঠিকমত বিবৃত করা অসম্ভব। কারণ, তার অনেকগুলি দিক্ আছে। যাঁরা বলেন প্রতিমা-পূজার আবশ্যক আছে তাঁরা নানা ভিন্ন দিক্ থেকে বলেন— কেউ বলেন আমাদের মন সীমাবদ্ধ এই জন্যে মানুষ মাত্রেরই পক্ষে প্রতিমাপূজা ছাড়া গতি নেই— কেউ বলেন যাঁরা দুর্ব্বলচিত্ত, কনিষ্ঠ অধিকারী তাঁদেরই এই সোপান দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া উপায় নেই অতএব তাঁদের খাতিরে এ সমস্তকে সহ্য করে চল্‌তে হয়— আবার আজকাল অনেকে বলেন, এই প্রতিমাপূজাই সকল উপাসনার শ্রেষ্ঠ— এইটেই হচ্চে আধ্যাত্মিকতার চরম।

এঁরা যে যে হেতু দেখান্ তা নিয়ে যদি তর্ক করতে যাই তবে তাতে কেবল তার্কিকতাই করা হবে। ধর্ম্মবিষয়ে তার্কিকতায় কোনো ফল হয় না বরঞ্চ অনিষ্ট হয়— অতএব সে থাক্।

আমি এইটুকু বল্‌তে চাই যে, মানুষ যখন ভগবানকে চায় তখন ঠিক কি চায় তা যদি পরিষ্কার করে বোঝে তাহলে অনেক জঞ্জাল কেটে যায়।

আমরা অনেক সময়ে যখন ঈশ্বরকে চাই বলি এবং বিশ্বাস করি তখন বস্তুত অন্যান্য বিষয়েরই মত আর একটা বিষয়কে চাই। যাদের চাওয়ার ঝোঁক ঘোচে নি তারা তাদের প্রার্থনার ফর্দ্দের মধ্যে ঈশ্বরের নামটাও রাখে। হয় ত খুব বড় করে রাখে —কিন্তু ঐ তালিকাটার মধ্যেই তার স্থান।

তারা কেউ বা তাঁকে "শান্তি" বলে চায়, কেউবা তাঁকে "সান্ত্বনা" বলে চায়, কেউবা তাঁকে "শক্তি" বলে চায়, কেউবা তাঁকে অন্যের অনুকরণে চায় কেউবা এই বলে চায় যে যখন ঋষিতপস্বীরা তাঁকে চেয়েছে তখন নিশ্চয় তাঁকে পাওয়াটা খুব গৌরবের।

আমরা ব্যামোর সময় ওষুধ চাই, অভাবের সময় টাকা চাই ঈশ্বরকে তেমন করেও চাই— সেটা যে একেবারে অন্যায় অসঙ্গত আমি তা বল্‌তে পারি নে— কিন্তু সেইরকম চাওয়া নিতান্তই গৌণ চাওয়া— মুখ্য চাওয়া নয়।

যে চাওয়া আধ্যাত্মিক চাওয়া সে তাঁকে পেতে চাওয়া নয়— তাঁর সঙ্গে মিল্‌তে চাওয়া।

পৃথিবীতে কিছুর সঙ্গে আমরা মিল্‌তে পারিনে এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে বেদনা। আংশিক ভাবে একটুমাত্র মিলি বাকি সব জায়গায় বাধে। তার প্রধান কারণই হচ্চে সকলেই নিজের সীমা দিয়ে আমাদের বাধা দেয়— তার সঙ্গে আপনাকে সবদিক দিয়ে মিলিয়ে দেওয়া অসম্ভব। স্বামীর স্বামিত্ব, বন্ধুর বন্ধুত্ব, পিতার পিতৃত্ব, পুত্রের পুত্রত্ব সর্ব্বত্রই অল্প কিছু দূর গিয়ে ঠেকে যায়— তার মধ্যে আত্মা আপনাকে পরিপূর্ণরূপে খুঁজে পায় না।

যিনি জগৎ জুড়ে আমার পিতামাতা স্বামীবন্ধু সব হয়ে আছেন তাঁর মধ্যেই দেহে মনে আত্মায় কোথাও আমাদের আর ঠেকেনা।

যাঁর মধ্যে আমি সমস্তকেই চাই তাঁকে যতই বিশেষের মধ্যে গণ্ডী দিয়ে বাঁধব ততই তিনি আমার আত্মাকে কোথাও না কোথাও এমন বাধা দেবেন যে অবশেষে তিনিও দশের মধ্যে একজন হয়ে উঠ্‌বেন।

একটি কথা ভেবে দেখো আমাদের দেশে দেবতা কেবল-মাত্র মূর্ত্তি নন— অর্থাৎ কেবল যে আমরা আমাদের ধ্যানকে বাইরে আকৃতি দিয়েছি তা নয়— তাঁরা জন্মমৃত্যু বিবাহ সন্তান-সন্ততি ক্রোধ দ্বেষ প্রভৃতি নানা ইতিহাসের দ্বারা অত্যন্ত আবদ্ধ— সে সমস্ত ইতিহাসকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে গেলে নিজের বুদ্ধিকে একেবারেই অন্ধ করতে হয় এবং সে সমস্ত ইতিহাসকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে ভগবানের সার্ব্বভৌমিকতা একেবারে চলে যায়— তিনি নিতান্ত আমাদের দেশের ও গ্রামের মানুষটি হয়ে পড়েন— সেইরকম বেশভূষা স্নানাহার আচারব্যবহার।

অথচ তিনিই আমাদের একমাত্র যাঁকে অবলম্বন করে, আমাদের চিত্ত দেশ ও জাতিগত সমস্ত সঙ্কোচ অতিক্রম করে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হবে— তাঁকে অবলম্বন করে আমাদের সর্ব্বত্র প্রবেশাধিকার বিস্তৃত হবে। কিন্তু আমাদের দেশে ধর্ম্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটিয়েছে। আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পরকে ঘৃণা করেছি, স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তৃষ্ণায় দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করচি— এবং সকল প্রকার

বুদ্ধি যুক্তিকে একেবারে লঙ্ঘন করে এমন সকল নিরর্থকতার সৃষ্টি করেছি যাতে মানুষকে মূঢ় করে ফেলে। আমরা ধর্ম্মের নামেই অপরিচিত মুমূর্ষুকে পথের ধারে পড়ে মরে যেতে দিই পাছে জাত যায় (এ আমার জানা)— অপরিচিত মৃতদেহকে সৎকার করিনে— মানুষের স্পর্শকে বীভৎস জন্তুর চেয়ে বেশি ঘৃণা করি। কেন এমন হয়েছে? আমরা ধর্ম্মকে আমাদের নিজের চেয়ে নেবে যেতে দিয়েছি। আমরা কেবলি বলেছি, আমরা নিকৃষ্ট অধিকারী, আমরা পারি নে, বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ মঙ্গল আমাদের জন্যে নয়। অতএব আমাদের পক্ষে এই সমস্ত মুগ্ধ কল্পনাই ভাল। এমনি ধর্ম্মকে সহজ করতে গিয়ে যে তাকে কেবলি নীচু করেছে তার আর উদ্ধারের উপায় নেই। ধর্ম্মকে যে উপরে রেখেছে, ধর্ম্ম তাকে উপরে টেনেছে— হিন্দু তা করে না। হিন্দু কেবলি বলেছে মেয়েদের জন্যে সর্ব্বসাধারণের জন্যে এই রকম আটপৌরে মোটা ধর্ম্মই দরকার— এই বলে সমস্ত দেশের বুদ্ধি ও আকাঙ্ক্ষাকে সেই মোটার দিকে ভারাক্রান্ত করে নেবে যেতে দিয়েছে। আর যাই হোক্ সাধনাকে নীচের দিকে নামতে দিলে কোনো মতেই চল্‌বে না। কল্পনাকে, হৃদয়কে, বুদ্ধিকে, কর্ম্মকে কেবলি মুক্তির অভিমুখে আকর্ষণ করতে হবে— তাকে কোনো কারণেই কোনো সুযোগের প্রলোভনেই ভুলিয়ে রাখ্‌তে হবে না। আমি নিজের জন্যে এবং দেশের জন্যে সেই মুক্তি চাই। মনে কোরো না সেই মুক্তি জ্ঞানের মধ্যে মুক্তি— সে প্রেমের মধ্যে মুক্তি। তুমি মনে কোরো না প্রতিমা পূজা ছাড়া প্রেম হতেই

পারে না— যদি সূফীদের প্রেমের সাধনার বিবরণ পড়ে থাক তবে দেখ্‌বে তাঁরা কি আশ্চর্য্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে কি অপরিসীম প্রেমের মিলন সাধন করিয়েছেন। তাঁদের সেই প্রেম কেবল একটা শূন্য ভাবের জিনিষ নয়, তা অত্যন্ত নিকট, অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অথচ তার সঙ্গে কোনো প্রকার কাল্পনিক জঞ্জালের আবর্জ্জনা নেই। এ সমস্ত কথা এমন করে চিঠির মধ্যে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা অসম্ভব। তুমি অনুরোধ করেছ বলে আমি যেমনতেমন করে এই প্রসঙ্গের অতি অল্পমাত্রই আভাস দিলুম। এর থেকে কোনো উপকার পাবে বলে আশা করি নে। ইতি ২০শে আষাঢ় [১৩১৭]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

১৩ জুলাই ১৯১০

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

মা, আমি তোমাকে গত পত্রে কিছু না কিছু বেদনা দিয়েছি। কেননা অনেক কথা আছে যা সংক্ষেপে একটা চিঠির মধ্যে লিখ্‌তে গেলে কঠোর হয়েই পড়ে। গভীরতর সত্যকে কেবলমাত্র ভাষার ভিতর দিয়ে ঠিক ব্যক্ত করা চলেনা। তুমি প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাব সত্ত্বেও নিশ্চয়ই আমাকে অনেকটা পরিমাণে জান— তার থেকে এটুকু তুমি বুঝ্‌তে পারবে আমাদের সমাজে যদি চ এমন অনেক জিনিষ আছে যাকে আমার বুদ্ধি সমর্থন করতে পারেনা কিন্তু তার প্রতি আমার হৃদয়ের বেদনা যথেষ্ট আছে। তুমি যেখানে বেদনা পেয়েছ আমি যে সেখানে কোনো বেদনা অনুভব করিনে তা মনেও কোরোনা। আমাদের দেশে প্রচলিত পূজার্চ্চনাবিধির মধ্যে এমন সুগভীর তত্ত্ব আছে যা বহুমূল্য। আমাদের দেশে যাঁরা মহাপুরুষ জন্মেছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁরা আশ্চর্য্য সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এ সমস্তই আমি মানি কিন্তু আমার মনের সমস্ত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও দেশব্যাপী দুর্গতি এবং তার কারণের কথা যখন ভাবি তখন কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে নিজেকে এবং অন্যকে ভোলাবার প্রবৃত্তি একেবারেই চলে যায়। আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে এত মূঢ়তা! নিজের শক্তিকে এমন চার-

দিক থেকে পঙ্গু করা, নিজের বুদ্ধিকে এমন একান্তভাবে অন্ধ করা! যে ধর্ম্ম আমাদের উপরের জিনিষ, উপনিষৎ যার পথকে "ক্ষুরধারনিশিত" দুর্গম বলেছেন, যাকে লাভ করবার জন্যে আমাদের সমস্ত শক্তিকে সচেষ্ট রাখা আবশ্যক, তাকে আমরা যথেচ্ছামত সস্তা করে নিয়েছি— এবং ক্রমাগত বলে এসেছি আমরা পারি নে, এ সব ধারণা আমাদের সাধ্যের অতীত, আমরা নিকৃষ্ট অধিকারী, আমাদের পক্ষে সত্যের বিকারই একমাত্র অবলম্বনীয়। নিজেকে দুর্ব্বল বলে স্বীকার করে নিজের ধর্ম্মকে যদি খাটো করি তবে কে আমাদের বল দেবে? ধর্ম্মকেই যদি নীচে রাখি তবে আমাদের উপরে তুল্‌বে কিসে? কিছুতেই তুল্‌চেনা, কিছুতেই জাগ্‌চিনে, আমরা প্রতিদিন মরচি তবু প্রতিকারের ইচ্ছামাত্রও নেই। এখন আমাদের এমন সময় এসেছে যখন এই সমস্ত মোহজঞ্জালকে চিরাভ্যস্ত মমত্ববুদ্ধিবশত স্বদেশের মর্ম্মস্থানে গুরুভার পর্ব্বতের মত স্তূপাকার জমিয়ে রাখা আর চল্‌বেনা।

আমি জানি সত্যের পথ সহজ নয়— পিছনে টেনে রাখবার যে কত বন্ধন আছে তার ঠিকানা নেই— যদি মনে করি একে একে একটু একটু করে সে সমস্ত শিথিল হতে থাক্‌বে তাহলে নৈরাশ্য আসে কিন্তু ঈশ্বর যখন রুদ্রবেশে দয়া করেন তখন তিনি এক আঘাতেই অকস্মাৎ অনেক বন্ধন ছেদন করে দেন— তখন তিনি অসহ্য বেদনা দেন কিন্তু সেই বেদনাকে সার্থক করেন। আমাদের দেশ তাঁর সেই বিশ্ব-উদ্বোধন প্রচণ্ড আঘাতের সৌভাগ্য

থেকে বঞ্চিত হবে না তা আমি বেশ অনুভব করচি এবং সেই দুঃখময় শুভদিনের জন্য নম্রশিরে প্রতীক্ষা করে আছি। ইতি ২৯শে আষাঢ় ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

২৫ নভেম্বর ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ এতদিন শিলাইদহে ছিলাম। সেখানে আমার শরীর ভালই ছিল। কাল বোলপুরে ফিরিয়া আসিয়াছি। বিদ্যালয় খুলিয়াছে এখানকার কাজ আরম্ভ হইয়াছে— এখন কিছুদিন আমাকে বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হইবে।

ঈশ্বর সকল অবস্থায় তোমার মনকে তাঁহার আপন করিয়া লউন, সুখে দুঃখে তুমি তাঁহারি হও এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

বাগবাজার

২৭ জানুয়ারি ১৯১১*

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখনি বোলপুরে যাইতেছি। অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।

তোমার চিত্ত শান্তি লাভ করুক্, ঈশ্বরের মধ্যে আশ্রয় লাভ করুক এই আমি প্রার্থনা করি। সম্প্রদায় হৃদয়কে আশ্রয় দিতে পারেনা। যিনি পারেন তাঁহার কাছেই যাইতে হইবে।

যদি প্রয়োজন বোধ কর তবে অনাথা মেয়েটিকে আমাদের কাছে পাঠাইলে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিব।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

৮ জুন ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

মনের মধ্যে অবসাদ আসিতে দিয়োনা। "নাত্মানমবসাদয়েৎ" আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করিবেনা শাস্ত্রের এই অনুশাসন আছে। আপনাকে যে আমরা দুর্ব্বল বলিয়া কল্পনা করি সে আমাদের একটা মোহ— নিজেকে সংসারের সমস্ত বাধা হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহার বিশুদ্ধ উজ্জ্বল স্বরূপটি কি দেখিতে পার না? তোমার চারিদিকে যাহাকিছু জমিয়াছে তাহা ত চিরদিনের নহে। নিজেকে তাহারই সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য করিয়া দেখিতেছ কেন? নিজেকে অনন্ত সত্যস্বরূপের মধ্যে দেখ— সংসারের মধ্যে দেখিয়োনা।

তোমাকে কিছুকাল হইল "রাজা" নামক একখানি আমার ছোট নাটক নিজের হাতে ঠিকানা লিখিয়া পোষ্ট করিয়া দিয়াছি —সেখানিও কি পাও নাই? যদি না পাইয়া থাক তবে কি উপায়ে তোমাকে পোষ্ট করিলে তুমি পাইবে আমাকে লিখিয়া জানাইবে। যদি দরোয়ানের হাত দিয়া পাঠাইলে ক্ষতি না থাকে লিখিয়ো অথবা যদি রেজেষ্ট্রি ডাকে পাঠাইলে তোমারই হাতে পৌঁছিবার সম্ভাবনা থাকে তাহাও আমাকে জানাইয়ো।

ঈশ্বর তোমার চিত্তকে স্থির করুন, দৃঢ় করুন, তাহাকে ভার-মুক্ত করিয়া দিন। ইতি ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

১১ জুন ১৯১১

ওঁ   শিলাইদা

কল্যাণীয়াসু

হোক্ না সংসার প্রতিকূল, সমস্ত সংসারের চেয়ে তোমার আত্মা অনেক বেশি বড়— আজ যাহার কাছে হার মানিয়া কান্নাকাটি করিতেছ হঠাৎ দেখিবে তাহা স্বপ্নের মত মিথ্যা। সে ধোঁয়ার মত তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে— এই ধোঁয়া বাহির হইতে দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু তোমার মধ্যে যে মৃত্যুহীন শিখাটি রহিয়াছে তাহা চোখে দেখিতে ছোট হইলেও পর্ব্বতপ্রমাণ ধোঁয়ার চেয়ে বড়। আমি পুনশ্চ বলিতেছি তোমার দুঃখ অবসাদ যতই প্রবল হৌক্ না কেন, তোমাকে তাহা যতই পীড়া দিক্ না কেন তবু আমি তাহাকে তুচ্ছ বলিয়াই মানিব। তাহার দ্বারা তুমি নিজেকে ছোট করিয়া দেখিয়োনা— অন্তরের মধ্যে নিজের মহত্ত্বকে ধ্রুব রূপে অনুভব কর এবং ঈশ্বরের সঙ্গেই তোমার নিত্য সম্বন্ধকে অন্য সকলের চেয়ে সত্য করিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা কর। হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। তুমি জয়ী হইবেই, তীরে উত্তীর্ণ হইবেই, রক্ষা পাইবেই ইহা ধ্রুবনিশ্চয় করিয়া জানিয়ো। তোমার জীবনের ইতিহাস একলা তোমার ইতিহাস নহে— ইহার মধ্যে সমস্ত জগতের মঙ্গলের ইতিহাস আছে— অতএব বিশ্বেশ্বর তোমাকে নষ্ট হইতে দিতে পারেন না— তোমার অদ্যকার ব্যর্থতার বেদনা সমস্ত বিশ্বের তপস্যার অগ্নিকে ইন্ধন জোগাইতেছে। তুমি

কেবলমাত্র একটি অন্তঃপুরের গৃহকর্ম্মরতা অখ্যাত রমণী নহ—তুমি বিশ্বের মানুষ, তুমি ঈশ্বরের আপন।

তোমাকে বই পাঠাইতে লিখিয়া দিলাম। ইতি ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

২৩ জুন ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

আমার প্রকাশকদের কাছ হইতে সেদিন এক পত্র পাইলাম যে তোমাকে তাঁহারা রেজেষ্ট্রি ডাকে বই পাঠাইয়াছেন। অথচ তাঁহাদের চিঠি পাইবার দুইদিন আগে কয়েকখণ্ড শান্তিনিকেতন এখানে আমার ঠিকানায় অকারণে আসিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে তাঁহারা তোমাকে পাঠাইতে গিয়া ভুলিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আজই সেগুলি তোমার নামে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিব।

তোমার জীবনের মধ্যে কি কাজ চলিতেছে তাহা তুমি জান না— তিনিই জানেন। তুমি মনে করিতেছ তোমার নৈরাশ্য তোমার ব্যর্থতা তোমার দুর্ব্বলতাই বুঝি চিরসত্য— তাহা তোমার একটা দুঃস্বপ্নমাত্র— হঠাৎ যেদিন তিনি তোমাকে জাগাইয়া দিবেন তখন দেখিবে অবসাদের আর লেশমাত্র নাই। ইতিমধ্যে যথার্থ আপনার উপর আস্থা স্থাপন কর, অবস্থা যেরূপই হউক্, সংসার সংগ্রামে তুমি যতবারই পরাভূত হও তবু জানিয়ো তাহাই চরম নহে— তাহা ভেদ করিয়াও তুমি পরম চরিতার্থতা-লোকে প্রকাশিত হইবে— তোমার সকল বেদনার মধ্যে নিত্যই তুমি সেই দিকে চলিয়াছ। মাটির মধ্যে হইতে বীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেও

আকাশের আলোকে বাহির হইবার মুখে সে কাজ করিতেছে তাহা সে জানেনা— সে আপন অন্ধকারকেই প্রবল এবং চিরন্তন বলিয়া ভুল করে। এই অকারণ দুঃখ হইতে তুমি আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়া আনন্দিতচিত্তে সফলতার জন্য প্রতীক্ষা কর। ইতি
৮ই আষাঢ় ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২

১৭ অক্টোবর ১৯১১

ওঁ কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

দূর দেশে আমার যাত্রার মেয়াদ আপাতত কিছুকাল পিছাইয়া গেল। বোধ করি ফাল্গুন মাসের পূর্ব্বে যাওয়া ঘটিবেনা। সম্প্রতি আমার শরীর অসুস্থ আছে— সে জন্য বোটে করিয়া গঙ্গা উজাইয়া যত দূর ইচ্ছা চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। যদি তাও না ঘটে তবে কোনো এক জায়গায় পদ্মার নির্জ্জন চরে বোট বাঁধিয়া মাস খানেক কাটাইয়া আসিব মনে করিতেছি।

আমি অন্তরের সহিত তোমার মঙ্গল কামনা করি। ইতি ৯ কার্ত্তিক ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩

৩০ জানুয়ারি ১৯১২

ওঁ কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, কিছুকাল হইতে প্রত্যহই আমাকে বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল— সেইজন্য আজ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত আছি। কিন্তু শীঘ্র আর সময় পাইবনা বলিয়া তোমাকে আজই পত্র লিখিতে বসিলাম।

তুমি যে লেখাটি পাঠাইয়াছ তাহাতে তোমার হৃদয়ের একটি বেদনা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে, সেইজন্য এই লেখা আমার বড় ভাল লাগিল। জাতীয় দুর্গতির দিনে আমাদের যিনি বিধাতা তিনি প্রলয়ের বিধাতা— তিনি আমাদের কখনই সুখে রাখিবেননা ও স্থির রাখিবেন না— আমাদিগকে তিনি নানা দিকেই আঘাত করিবেন— অনেক পরিচিতকে বিদায় করিতে হইবে এবং অনেক অপরিচিতকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে। তাহার যে দুঃখ সে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে— কেননা সমস্ত জাতিকে জড়তার মধ্যে ডুবিয়া মরিতে দিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেকের উপরেই নবযুগের পরম দায়িত্ব রহিয়াছে— আসক্তির বন্ধন কাটিতেই হইবে, মুক্তির জন্য জাগিতেই হইবে— তোমরা দেশের মা, তোমরা দেশকে পিছনের দিকে টানিয়ো না— নূতনের মধ্যে অনেক আশঙ্কা অনেক বিপদ আছে তবু সেই যুগবিধাতার শঙ্খ-ধ্বনি শুনিয়া তোমাদের সন্তানদিগকে যাত্রার পথেই অগ্রসর

করিয়া দিতে হইবে। আজ আমাদের সম্মুখের সমুদ্রে ঢেউ উঠিতেছে দেখিয়া মনকে অভিভূত হইতে দিয়ো না— মনে করিয়ো-না আমাদের তরীর কর্ণধার কেহই নাই— কর্ণধার তখনি থাকেন না, নৌকা যখন কেবলি পুরাতন ঘাটে বাঁধা পড়িয়া থাকে— তখন তাহার পাল গুটানো, তাহার হাল নিশ্চল, তাহার সমস্তই ব্যর্থ —তখনি তাহার মাঝিকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু চির-উন্নতিশীল মনুষ্যত্বের পথে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইলেই মাঝি তাঁহার হালের কাছে আসিয়া বসেন— তখন আর ঝড়তুফানকে ভয় কিসের? অবসাদকে পোষণ করিবনা, মাটির উপর মুখ দিয়া বুক দিয়া পড়িয়া থাকিবনা, অতি পুরাতন অতীতের মধ্যে সমস্ত আশা-ভরসাকে চিরদিনের মত বদ্ধ করিয়া রাখিবনা এই আমাদের পণ হউক! ইতি ১৬ই মাঘ ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

এখনো বিলাতে যাত্রা করি নাই কিন্তু যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। আগামী ৬ই চৈত্রে জাহাজ ছাড়িবে। এতদিন কলিকাতায় বিস্তর গোলেমালে আমার দিন কাটিয়াছে তাই ভারতবর্ষ হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্বে কিছু দিন এখানকার নির্জ্জন নদীতীরে শান্তি উপভোগ করিয়া লইবার জন্য আসিয়াছি। বোধ হয় চৈত্রমাসের আরম্ভে কলিকাতায় যাইব। পৃথিবী প্রদক্ষিণ সারিয়া কবে দেশে ফিরিব তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না। অনেকদিন যে সকল বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছি তাহার সমস্ত অভ্যাস ও সংস্কার হইতে নিজেকে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্যই আমার এই তীর্থযাত্রা। যখন পৃথিবী হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় আসিবে তখন যেন সমস্ত আবরণ কাটিয়া যায় এই আমার ইচ্ছা।

ঈশ্বর তোমাকে শক্তি দিন, নিষ্ঠা দিন, শান্তি দিন এই আমি আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ১০ই ফাল্গুন ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

৫ মার্চ ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

যে মনুষ্যলোকে আসিয়াছি সেখানে একটা প্রবেশাধিকার পাওয়া দরকার। এখান হইতেই ত পাথেয় সঞ্চয় করিতে হইবে। পালা শেষ না করিতে পারিলে ত ছুটি নাই— মনুষ্যত্বের পালাটা সম্পূর্ণ করিতে হইলে তাহাকে সকল দিকেই পূর্ণ করিয়া যাইতে হইবে। অদ্যকার যুগে পৃথিবীর একটা মস্ত শক্তির ক্ষেত্র য়ুরোপ— সেখানে এমন একটি বিরাটের আবির্ভাব হইয়াছে যাহা সমস্ত জগৎটাকে টলাইতেছে— যাহা বিদ্যুৎকে বাঁধিতেছে, পৃথিবীকে দোহন করিতেছে, মানুষের চিত্তসমুদ্রকে মন্থন করিতেছে— তাহাকে যদি ভাল করিয়া দেখিয়া ও চিনিয়া না যাই তবে পৃথিবীর বর্ত্তমান যুগের কাছ হইতে ঠিকমত বিদায় লওয়া হইবে না। কেন তবে আমি এ যুগে জন্মিয়াছিলাম? কলসি আনিলাম কিন্তু ভরিয়া লইবার জন্য ঝরনার ধারে গেলাম না। এখনকার কালে যে ঝরনা ঝরিতেছে তাহার ধারা কি এ জীবনে ব্যর্থ করিতে দিব? তুমি মনে যে আশঙ্কা করিতেছ এক একবার সে আশঙ্কা আমার মনেও উঠিয়াছে— কিন্তু আবার ভাবি মরিবার দিনে ঘরই কি আর বাহিরই কি— বরঞ্চ ঘরের চেয়ে বাহিরই ভাল— বাধা যেখানে নাই সেইখান হইতেই যাত্রা শুভযাত্রা— বিদায় লইবার

দিনে ঘরের কোণ হইতে বিদায় লইবনা, পৃথিবী হইতেই বিদায় লইব। গৃহবন্ধন হইতে বাহির হইয়া যাওয়া মৃত্যুর পুর্ব্বেকার সেই ভূমিকা। তাই মনটাকে মুক্ত করিতে চাই— আত্মীয় স্বজন ঘর দুয়ার ও স্বদেশ সমাজের লক্ষ লক্ষ স্থূল সূক্ষ্ম অভ্যাসের জাল কাটিয়া একবার সমস্ত মানুষের দলে আপনাকে ভর্ত্তি করিয়া লইতে চাই। তাহা হইলেই বলিতে পারিব মানুষের পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম ও মানুষের পৃথিবী হইতে বিদায় লইলাম। আমি বাঙালী হইয়া ঠাকুরবাড়িতে জন্মিয়াছি এই ত আমার শেষ পরিচয় নহে।

ফাল্গুনের শেষে কলিকাতায় যাইব। তখন আমাকে স্মরণ করাইয়া পত্র দিয়ো যে বইগুলি পাও নাই সেখান হইতে পাঠাইয়া দিব। কোন্‌গুলি নাই লিখিয়ো। ইতি ২২শে ফাল্গুন ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

১৮ মার্চ ১৯১২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, আমার সময় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। কাল ভোরে উঠে যাত্রা করতে হবে।

প্রতিমা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো বিরুদ্ধতা নেই। অর্থাৎ যদি কোনো বিশেষ মূর্ত্তির মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে বিশেষ সত্য বলে না মনে করা যায় তাহলেই কোনো মুস্কিল থাকে না। তাঁকে বিশেষ কোনো একটি চিহ্নদ্বারা নিজের মনে স্থির করে নিয়ে রাখলে কোনো দোষ আছে এ কথা আমি মনে করি নে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো মূঢ়তাকে পোষণ করলেই তার বিপদ আছে। ঠাকুরের বিবাহ দেওয়া, তাঁকে খাওয়ানো পরানো, ওষুধ খাওয়ানো ইত্যাদি নিরতিশয় খেলা। ঠাকুরকে খাওয়াতে পরাতে হয় বটে কিন্তু সে হচ্চে যেখানে তিনি খান পরেন— সে কেবল মানুষেরই মধ্যে, জীবের মধ্যে। তাঁর সেবা তিনি সেইখান থেকেই সত্যভাবে গ্রহণ করেন— অন্য কোনো রকম করে দিতে গেলে তাঁকে ফাঁকি দেওয়া হয়। যাই হোক্ আজ আর এ সব কথা নিয়ে তর্ক করব না।

যদি চ তোমাকে কখনো দেখি নি তবু তোমাকে আমি আত্মীয় বলেই অনুভব করেছি। তুমি আমার মন থেকে আমার আশীর্ব্বাদ আমার মঙ্গলকামনা স্বভাবতই আকর্ষণ করে নিয়েছ। তোমার

পত্রে তোমার চিত্তশক্তির পরিচয় পেয়ে আমি কতবার বিস্ময় অনুভব করেছি। ঈশ্বর তোমার অন্তরে যে স্বাভাবিক শক্তি দিয়েছেন সেই শক্তির অনুসরণ করেই তুমি তোমার কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারবে সন্দেহ নেই। যিনি তোমার ধীশক্তিকে এমন অসামান্য করেছেন তিনি আপনাকে দিয়েই তাকে সার্থক করে তুল্‌বেন। কোনো নিকট পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও আমি যেন তোমার স্নেহময় মাতৃহৃদয়ের আভাস পেয়েছি— সে আমি ঈশ্বরেরই কল্যাণ ইচ্ছার প্রকাশ বলে মনে করি। তুমি যে দূরে থেকেও আমার মঙ্গল কামনায় উদ্বেগ অনুভব কর সে আমার প্রতি ভগবানের আশীর্ব্বাদ। আজ তবে তোমাকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। ইতি ৫ই চৈত্র ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭

২৫ মার্চ ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

মাতঃ, বাধা পড়িল— যাত্রার দিন প্রাতে এমন মাথা ঘুরিয়া শয্যাগত করিল যে কোনোমতেই উঠিবার শক্তি রহিলনা। তাহার পূর্ব্বে কয়দিন অত্যন্ত বেশি পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল— তাহার সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাতের উপসর্গ থাকাতে হঠাৎ এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। এখনো মাথার পরিশ্রম নিষেধ। শিলাইদহে নির্জ্জনে পালাইয়া আসিয়াছি। আজ আর অধিক নহে। ইতি সোমবার

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮

৭ এপ্রিল ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

শরীরের জন্যই আবার একবার বিলাতে যাওয়ার চেষ্টা করিতে হয় কারণ সেখানে ভালরূপ চিকিৎসার উপায় আছে। কিছুদিন এখানে আসিয়া ভাল ছিলাম কিন্তু পুনশ্চ দেখা যাইতেছে এখনো সুস্থ হইতে পারি নাই এবং রোগের দুর্ব্বলতা এখনো শরীরের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। এই জন্য প্রবাস যাত্রার প্রস্তাব এখনো ত্যাগ করিতে পারিলাম না। বোধ হয় আর দুই একমাসের মধ্যেই বিদায় গ্রহণ করিব। ইতি ২৫শে চৈত্র ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯

১৩ মে ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

আগামী ১৪ই জ্যৈষ্ঠে বম্বাই বন্দর হইতে আমাদের জাহাজ ছাড়িবে। ১০ই কলিকাতা হইতে যাত্রা করিব।

সম্প্রতি শিলাইদহে আছি। এখান হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠে কলিকাতায় যাইব।

এখন যাত্রা করিবার মত শরীরের অবস্থা হইয়াছে কিন্তু শরীর সুস্থ হয় নাই। জাহাজে সমুদ্রের হাওয়ায় উপকার হইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

একটা নবজীবনের পালা সুরু করিতে পারিব এই প্রত্যাশা করিয়াই এবারে যাত্রা করিতেছি— তোমরাও সকলে আমার সেই কল্যাণ কামনা করিয়া আমাকে বিদায় দাও— অসত্য হইতে সত্যের পথে আমার এই যাত্রা হউক্।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ৩০শে বৈশাখ ১৩১৯

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০

২২ মে ১৯১২

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

মা তোমার স্নিগ্ধ পত্রখানি পাইয়া বড় তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। দেবপূজার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছ সে সম্বন্ধে আমার একটি কথা আছে।

হৃদয় আপনার কাজ আপনার নিয়মে করে তাহার সঙ্গে বুদ্ধির নিয়ম মেলেনা এবং না মিলিলে কোনোই দোষ নাই। কিন্তু সে স্থলে সত্যভাবেই হৃদয়টি থাকা চাই নহিলে তেমন মূঢ়তা আর কিছুই হইতে পারে না। মা ছেলেকে আদর করিবার সময় আধ আধ করিয়া প্রলাপ বকিয়া থাকে— কিন্তু তাহা মিষ্ট এবং সত্য। কিন্তু মাতৃস্নেহ হইতে বাদ দিলে তেমন অদ্ভুত অসঙ্গত আর কি আছে! মাতাকে শিশুর আদর করার প্রণালী শিখাইতে হয় না— শিশুকে ভুলাইবার যে সমস্ত প্রচলিত অর্থহীন ছড়া আছে তাহাও মা যখন স্নেহের স্বরে ব্যবহার করে তখন তাহা নূতন ও সার্থক হইয়া উঠে। কিন্তু যদি কেহ শাসনের দ্বারা এই প্রণালীকে কৃত্রিম করিয়া ইহাকে নির্ব্বিচারে সর্ব্বজনের ব্যবহার্য্য করিয়া তুলে তাহা হইলে মূঢ়তায় দেশ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। কারণ ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক ভক্তি দুর্লভ অথচ কেবলমাত্র স্বভাবভক্তই যে পদ্ধতিতে সত্যভাবে চলিয়া তাহার সফলতা সহজে লাভ করিতে পারে তাহাকেই সর্ব্বসাধারণের একমাত্র পন্থা করিলে জ্ঞানের পথ ত

রুদ্ধ হয়ই, হৃদয়ের কার্য্যও বিকৃত হইতে থাকে। এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে জ্ঞানের বিষয়ে নকল চলে, এমনকি নকল করিয়াই তাহাকে আয়ত্ত করিতে হয় কিন্তু হৃদয়ের বিষয়ে নকল চলে না, নকল করিলেই তাহা অসহ্য ভার হইয়া পীড়ার সৃষ্টি করে। এইজন্যই আমাদের দেশে ভক্তির যে প্রণালী তাহা হৃদয়বান সাধকের পক্ষেই উপযোগী কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর— তাহারা তাহার মধ্য হইতে যেটুকু রস পায় তাহার চেয়ে মূঢ়তাই বেশি সঞ্চয় করে। ইহাতে কেবল অল্প কয়জনের উপকার হয় কিন্তু সমস্ত জাতিকে অন্ধ ও স্বাধীনবুদ্ধিবিচারহীন করিয়া নষ্ট করে। সেই দুর্গতি কি সমস্ত দেশের মধ্যে দেখিতেছ না? ইহারা যে কোনোমতেই কোনো মঙ্গলকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারেনা কেবল সমাজশাসনের দ্বারা বলপূর্ব্বক চালিত হইয়া স্বজাতিকে জড়ত্বে ও চিরদাসত্বে আবদ্ধ করিয়াছে তাহার মূলে কি এই পূজার্চ্চনাবিধি নাই? তাহারা দেবতাকে যে ভাবে গ্রহণ করে, দেবকাহিনীসকলকে যেরূপ অত্যন্ত ক্ষুদ্রভাবে বিশ্বাস করে এবং ধর্ম্মের নামে যেরূপে মনুষ্যত্ব-বিরুদ্ধ দুর্নীতিকেও বরণ করিয়া লয় তাহাতে কি সমস্ত জাতির মর্ম্মস্থলে মৃত্যুবাণ বাজে নাই? দেশের মানুষকে কি এইরূপ অন্ধতার মধ্যেই ফেলিয়া রাখিব?

কিন্তু মা, যেখানে হৃদয় আপন স্বভাবের পথে চলে সেখানে সে সত্য পরিণামেই যায়— কিন্তু সেই স্বভাবের পথ অল্প লোকেরই। সে লোকেরা জ্ঞানী না হইতে পারেন পণ্ডিত না হইতে পারেন

কিন্তু তাঁহারাই সত্যের অধিকারী— তাঁহারা নিরক্ষর চাষা বা *সরলপ্রাণ স্ত্রীলোক* হইলেও আমাদের সমালোচনার বাহিরে। আমরা যখন এ সম্বন্ধে বিচার করি তখন জাতির দিক দিয়া করি।

মা, শেষকালে আমার কথা এই তুমি আমাকে যে ভক্তি দিয়াছ আমি কখনই তাহার অধিকারী নহি তাই তোমার ভক্তিকেই তোমার আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আজ আমি বিদায় লইলাম। আগামী শুক্রবারে আমি এখান হইতে যাত্রা করিব। ইতি ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

ওঁ 16, More's Garden,
Cheyne Walk, S. W.

মা, তোমার পত্রখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে কালই আমি ভারতবর্ষ যাত্রা করিতেছি এবং আমার প্রবাসের শেষদিনে তোমার পত্রে আমি যেন মাতৃভূমির আহ্বান লাভ করিলাম।

এদেশে আমি সমাদর পাইয়াছি কিন্তু সেইটেকেই আমি সকলের চেয়ে বড় লাভ মনে করিনা। কিন্তু ভগবান যে জন্য এদেশে আমাকে টানিয়া আনিয়াছেন তাহার সন্ধান পাইয়াছি। তিনি আমার কাছে বিদেশীর ভিতর দিয়া আত্মীয়ের মূর্ত্তি ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

আমি শুধু বাহবা পাই নাই আমি হৃদয় পাইয়াছি। মানুষ যে মানুষের কত কাছে তাহা দেখিয়াছি। ভাষা, ধর্ম্ম, ইতিহাস, আচার ও গিরি নদী সমুদ্রের ব্যবধান কতই তুচ্ছ— যেখানে সত্য মানুষটি বাস করে সেখানে কোনো ভেদ নাই। সেই ভেদ-বুদ্ধির হাত হইতে মুক্তি না পাইলে তাঁহার মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ, মানুষের কাছে তাঁহার অখণ্ড প্রকাশই মানুষের পক্ষে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। সেই প্রকাশকে আমরা বর্ণভেদ বিজাতিবিদ্বেষ প্রভৃতি সহস্র আকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলি— সেই আচ্ছাদন সরাইয়া ফেলিতে হইবে— নহিলে এই

পৃথিবীর মহাতীর্থে মানুষের হৃদয়মন্দিরে দাঁড়াইয়া মানুষের হৃদয়েশ্বরের পূজা সমাধা হইবেনা, বৃথা দ্বারের বাহির হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।

আমার কোন্ বই তোমার কাছে নাই আমাকে জানাইয়ো—দেশে গিয়া তোমাকে পাঠাইয়া দিব। এ চিঠি যখন পৌঁছিবে সম্ভবত তাহার সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমাদের জাহাজ ভারতবর্ষের বন্দরে গিয়া লাগিবে।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২

৬ নভেম্বর ১৯১৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ আমি আসিয়া অবধি নানা কাজে এবং উৎপাতে ব্যস্ত হইয়া আছি। বিলাতে আমার খ্যাতি হওয়াতে এ দেশে আমার শান্তির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। এখন হইতে অধিকাংশ সময়েই আমাকে লোকের ভিড় ঠেলিয়া চলিতে হইবে। আমাদের দেশে মেয়েরা ভয় করেন পাছে তাঁহাদের সন্তানদের প্রতি অশুভ দৃষ্টি পড়ে। জনতার সহস্র চক্ষুর দৃষ্টি আমার মত মানুষের পক্ষে অশুভ দৃষ্টি— আশা করি ইহা হইতে আমার জননী আমাকে আবৃত করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন।

আমার শরীর ভালই আছে। বিলাতে থাকিতে আমার রোগের চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছি— বহুদিনের সেই উপসর্গ হইতে এখন মুক্তি পাওয়া গেছে। ইতি ২০শে কার্ত্তিক ১৩২০

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩

২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪

ওঁ

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

নানা উৎপাতে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া আছি। কাজও করিতে পারিতেছি না, বিশ্রামও দুর্লভ হইয়াছে। এ সমস্ত জাল ছেদন করিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্য চিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

আমি বিষয় কর্ম্ম দেখি না— যাঁহারা দেখেন, শুনিয়াছি তাঁহারা পাবনার উকীল মনোনীত করিয়াছেন। তবু একবার তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব। যাহাই হউক্, এ সম্বন্ধে আমি নিজের হাতে কোনো কর্ত্তৃত্ব রাখি নাই।

যাহাকে আমার অত্যন্ত প্রয়োজন তিনি আমার চারিদিকে লোক জমা করিয়া লুকাইয়া আছেন। ইহাতে সর্ব্বদা মনে আঘাত পাইতেছি। এই ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইতে হইবে। সর্ব্বদা যে সমস্ত অপমানের আঘাত পাইতেছি তাহাই আমার যথার্থ পুরস্কার— এই অপমানের অন্ধকারময় আড়াল হইতেই তিনি তাঁহার আলোটি লইয়া হাসিমুখে দেখা দিবেন আমি তোমাদের সকলের কাছে এই আশীর্ব্বাদটিই চাই। ইতি ২০ মাঘ ১৩২০

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

৪ মার্চ ১৯১৪

ওঁ বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার সঙ্গে দেখা হইলে হয়ত কথা বুঝাইয়া বলা সহজ হইত কিম্বা হয়ত হইত না। ঈশ্বর ত আমাকে গুরুর আসনে বসান নাই— আমি ত কাহাকেও পথ দেখাইবার শক্তি রাখি না— কেন না আমি কবি মাত্র— আমি পথ চলিতে চলিতে গান গাহি— গম্যস্থানের খবর লইও না কাহাকেও দিই না। কেহ যখন জিজ্ঞাসা করে কেমন করিয়া সাধনা করিব আমি বলি আমি ত সাধনা করি নাই।— আমাকে ঈশ্বর যে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন সেখানে যে আমি নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাইয়াছি তাহা নহে— প্রথম হইতেই বিস্তর আঘাত সহিয়াছি— কিন্তু ছেলেবেলা হইতেই এই পৃথিবীর আলো এবং আকাশ, এখানকার প্রাণের লীলা এবং শক্তির তরঙ্গবেগ আমার মনকে অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছে। জগতের মাঝখান দিয়া আমি অচেতনভাবে চলিয়া যাই নাই— ইহার স্পর্শাভিঘাতে আমার চিত্তবীণার সমস্ত তার অহরহ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। সেই ঝঙ্কারই আমাকে মন্ত্র দিয়াছে। আমার প্রাণের রাস্তা দিয়া আমার গানের সুরের ভিতর দিয়াই আমি যাহাকিছু লাভ করিয়াছি। আমার সমস্ত জীবনব্যাপী সুতীব্র সুখদুঃখের পরিণতিই আজ একটি নমস্কাররূপে মাটি স্পর্শ করিল। এই জীবনের ব্যাপার যে কেমন করিয়া ঘটে সে রহস্য ত আমার জানা নাই— সেই জন্যই আমি

কাহাকেও উপদেশ দিতে পারি না— এবং যাহারা আমাকে গুরু বলিয়া ভক্তি করে তাহাদের সে ভক্তি আমি কখনই মনের মধ্যে গ্রহণ করি না। মাতঃ, তোমার মধ্যে একটি বেদনা আছে একটি শক্তি আছে— তোমার চিত্ত সাধারণ সংসারী লোকের মত অসাড় নয়— তোমার সেই বেদনার ভিতর দিয়া তোমার অন্তর্যামী কি তোমাকে কাছে টানিয়া লইতেছেন না? ব্যবধান সমস্ত ঘুচাইয়া দিয়া তবে তিনি ছাড়িবেন। নহিলে তিনি তোমাকে কাঁদাইবেন কেন? হাত জোড় করিয়া মাথা নত করিয়া পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া আপনাকে প্রতিদিন বারবার তাঁহার কাছে সমর্পণ করিয়া দাও— তিনি তোমাকে গ্রহণ করিবেন— তিনিও যে তোমার পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩২০

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫

২৮ ডিসেম্বর ১৯১৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, আমি কিছুকাল ধরিয়া ভ্রমণে ফিরিতেছিলাম— এখানকার কেহই আমার ঠিকানা জানিতেন না। সেই জন্য তোমার দুইখানি পত্র আমি বহুদিন পরে পাইয়াছি। আবার আমি ঘুরিতে চলিব। বসিয়া থাকার কাজ আমি ত একরকম সারিয়া লইয়াছি —এখন আর আপিস চলেনা— দিনের শেষে বাহির হইয়া পড়িবার সময় আসিয়াছে। বসিয়া থাকিলেই বোঝা বাড়িয়া ওঠে— চলিয়া চলিয়া সে সমস্ত ক্ষয় করিয়া ফেলিতে হয়। অনেক-দিনের অনেক বোঝা এবার ক্ষয় করিয়া তবে ত খালাস পাইব।

সংসারের পথ চলায় তোমাদের আমি কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার আছে কি, মা? ভগবান আমার হাতে একটা খঞ্জনী দিয়াছিলেন সেইটে বাজাইয়া বাজাইয়া এতদিন গান গাহিয়া ফিরিয়াছি— ভিক্ষাই ত ছিল আমার সম্বল। এবার ভিক্ষাপাত্র ভাঙিবার চেষ্টায় আছি— গানও বন্ধ করিবার সময় আসিয়াছে, তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া এমন সত্য হইয়া ওঠ যে ঈশ্বর তোমাকে গ্রহণ করিতে কোনো বাধা না পান। ১৩ পৌষ ১৩২১

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬

১ জানুয়ারি ১৯১৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, আমি তোমাকে কয়েকদিন হইল যে চিঠি লিখিয়াছি তাহা এতদিনে বোধ করি পাইয়াছ। আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম— কাহারো চিঠি পাই নাই কাহাকেও চিঠি লিখি নাই। কিছুদিনের জন্য এখানে আছি আবার ঘুরিতে বাহির হইব এই আমার ইচ্ছা।

আমার বাক্যের দ্বারা তোমার চিত্তকে আমি ধ্রুব আশ্রয় দিতে পারি এমন ভগবৎ-প্রভাব আমার নাই এ কথা তুমি নিশ্চয় জানিয়ো। কিন্তু এ কথাও সত্য যে তোমার প্রতি আমি গভীর স্নেহ অনুভব করিয়াছি। তোমাকে দেখি নাই কিন্তু কেমন করিয়া তোমাকে এমন আত্মীয় বলিয়া জানি তাহা আমার নিজের কাছেই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। নানা লেখায় নানা কাজে লোকসমাজে নানাভাবে আমি আমার পরিচয় দিয়াছি। কেহ ভাল বলে কেহ মন্দ বলে, পুরস্কারও পাই দণ্ডও পাই। কিন্তু যে জায়গায় কোনো সাংসারিক বন্ধন কোনো প্রয়োজনের সম্বন্ধ কোনো দেখাসাক্ষাৎ নাই সেখানে কোনো একজন লোককে আপনার করিয়া পাওয়া হাজার লোকের বাহবা পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি। তাহাতে বুঝিতে পারি জীবনের সাধনার মধ্যে কোথাও কিছু সত্যের রং ধরিয়াছে,

সেই সত্য সমস্ত অপরিচয় অতিক্রম করিয়া কাহারো কিছু কাজে লাগিল। তোমার চিঠিতে যে সরল শ্রদ্ধা তুমি আমাকে অজস্র দিয়াছ তাহা এমন স্নিগ্ধ যে অনেক প্রবল সন্তাপের মধ্যেও তাহা আমার হৃদয় জুড়াইয়াছে। জান ত চারিদিক হইতে অবমাননা আমি অনেক পাইয়া থাকি; সে জন্য কাহাকেও দোষ দিই না। তপস্যাও করিব অথচ তাপ সহিব না এমন সৌখীন তপস্যার কোনো অর্থ নাই। কিন্তু তবুও তাপ ত তাপই বটে। তাই এই সমস্ত লাঞ্ছনার ভিতরে তোমার স্নিগ্ধ চিঠিগুলি যখন পাই তখন আমার তপ্তললাটে আমি আমার দেশ-মাতার সেবাহস্ত অনুভব করি। আমার কাছে তুমি শান্তির সম্বল চাহিতে আসিয়াছিলে কিন্তু আমাকে তুমি অনেক সান্ত্বনা দিয়া গিয়াছ।

তোমাকে দিবার মত কিছু শক্তি বা সঞ্চয় আমার নাই— অন্তরের আশীর্ব্বাদ দিলাম। তোমার জীবনের সমস্ত অভাবকে ভগবান তাঁর প্রেমের অমৃতরসে পরিপূর্ণ করিয়া রাখুন। তোমার ব্যথার প্রদীপে তাঁর পূজার আলোকশিখা জ্বলিয়া উঠুক।

আমার জন্য মা তুমি মনে কোনো উদ্বেগ রাখিয়ো না। এখন ত পান্থশালায় আমার বসিয়া থাকার দিন নয়— এখন আমি চলার পথে। দীর্ঘ কাল আমার কোনো খবর পাও বা না পাও তোমার প্রতি আমার স্নেহ ম্লান হইবে না— সেই স্নেহই যদি তোমার অন্তরে সান্ত্বনা দিতে পারে তবে তাহা সফল হইল—

তাহার অধিক কোনো সম্পদ আমার নাই। ইতি ১৭ই পৌষ ১৩২১

একান্ত শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, এখনো যাওয়া হয় নাই। বড় ক্লান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া কিছুদিনের জন্য শিলাইদহে পদ্মায় নিভৃতে বিশ্রামের আশায় গিয়াছিলাম। আবার কাজের পাকে ও বিপাকে পড়িয়া কলিকাতার সভায় বক্তৃতা দিতে আসিয়াছিলাম। তার পরে আবার কাজের চক্রে এখানে টানিয়াছে। ছুটি পাইলে আর একবার ইচ্ছা আছে শিলাইদহে গিয়া কিছুকাল ছুটি ভোগ করিব। সঙ্গে আমার ছেলে ও বৌমা যাইবেন। যদি সম্ভবপর হয় একবার বৌমাকে দেখিয়া যাইতে পার। আমি কিছু বল লাভ করিলে তার পরে জাপানে যাইব। বছর দুই তিন প্রবাসে কাটাইবার সঙ্কল্প আছে।

মা, পত্রের মধ্য দিয়া তোমার যেটুকু পরিচয় ও তোমার কাছ হইতে যে স্নিগ্ধ শ্রদ্ধাটুকু পাইয়াছি সে আমার বিশেষ সমাদরের ও আনন্দের সামগ্রী তাহা নিশ্চিত জানিয়ো। সংসারের পথে চলিবার সময় যাহা আমাদের গভীর প্রয়োজনের সামগ্রী তাহা আকারে ও পরিমাণে বৃহৎ নহে। তৃষ্ণার স্নিগ্ধ জল এতটুকু হইলেই চলে কিন্তু যখন রৌদ্র প্রখর হয় তখন তাও দুর্লভ— অথচ তপ্ত বালির অভাব নাই।

এখানে আমার কাছে যে দুখানি বই আছে তাই পাঠাইলাম।

কলিকাতায় গিয়া আরো কিছু পাঠাইব।

তোমার জীবনে যদি অতৃপ্তি ও দুঃখ থাকে তবে সেও মূল্যবান। কেননা তোমার প্রকৃতিতে যে গভীরতা আছে তাহা কখনই অপূর্ণ থাকিতে পারেনা। ঈশ্বর তোমার জীবনে তোমার বেদনাকে সার্থক করিতেছেন— নিশ্চয় একদিন তাহা স্পষ্ট বুঝিবে। ইতি ৬ ফাল্গুন ১৩২১

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮

১৮ এপ্রিল ১৯১৫

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

মা, এই জগৎসংসারে সুন্দর, মঙ্গল এবং সত্য যে কতদিকে কত পূর্ণ হইয়া আছে একবার সমস্ত মন দিয়া তাহা গ্রহণ কর তাহা হইলেই নিজের মধ্যে যাহা ক্ষুদ্র যাহা কুশ্রী তাহা মিলাইয়া যাইবে। অতি বিরাট সঙ্গীতে আকাশ প্লাবিত হইয়া যাইতেছে— জীবনের আবরণ মোচন করিয়া একবার সেই সঙ্গীতে দেহমনকে মগ্ন করিয়া ধৌত করিয়া নববর্ষে নূতন জন্ম লাভ কর। পুরাতনকে বারবার ত্যাগ করিয়া তবে আমরা অমৃতলোকের যাত্রায় অগ্রসর হইতে পারিব। যে পুরাতন মলিন, যাহা নির্জ্জীব, যাহা জীবনের উপর ভারের মত, তাহাকে প্রাণপণে এই জগদ্ব্যাপী আনন্দসাগরে সৌন্দর্য্যতরঙ্গে বিসর্জ্জন দাও— নিজের ভিতরকার মৃত্যুহীন পবিত্র অমৃত রূপটি দেখ— দেখ একবার জীবন কি মহৎ, জগৎ কি আশ্চর্য্য, যিনি চিরদিনের সঙ্গী তিনি কি অন্তরতম— দুঃখগ্লানির ছায়ার খেলা কি তুচ্ছ, মানুষের আত্মার শক্তি মানুষের সংসারের অভিঘাতের চেয়ে কত বড়! এই নববর্ষ তোমার জীবনে সার্থক হউক্।

৫ই বৈশাখ ১৩২২

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯

৮ অক্টোবর ১৯১৫

ওঁ

শ্রীনগর

কাশ্মীর

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, তোমার পত্রের উত্তর দিই নাই বলিয়া ত মনে হয় না। কিছুকাল হইতে আমি ঘুরিতেছি, আমার কোনো নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা নাই, সেই জন্যই হয়ত ডাকের গোলমাল ঘটিয়া থাকিবে।

এখন আমি কাশ্মীরে। দেড়মাস এখানে কাটাইয়া হয়ত দেশে ফিরিব। বিতস্তা নদীতে বোটে করিয়া কিছুদিন ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা আছে।

তোমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছি এমন কথা কল্পনা করিয়ো না। ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। ইতি ২১ আশ্বিন ১৩২২

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪০

২৮ ডিসেম্বর ১৯১৫

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ব্যস্ত ছিলাম— এখনো চোকে নাই— শেষ পর্য্যন্তই চুকিবেনা— শরীর মন বড় ক্লান্ত— তাই কয় দিন তোমার চিঠিখানির উত্তর দিতে পারি নাই। কাল কলিকাতায় যাইব— সেখানে গোলমালের মাত্রা বেশি— তাই আজ একটু সময় করিয়া তোমাকে লিখিতে বসিলাম। কাজ করিবার ক্ষমতা এখনো আছে অথচ কাজ করিবার উপকরণ-গুলো অনেকটা জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে সেইজন্যে ফুটো নৌকো বাহিবার কাজটা বেশি ক্লান্তিকর হইয়াছে— অথচ সকলেরই দাবী মিটাইতে হয়, কেননা এখনো একেবারে ফতুর হই নাই —তাই আমার অবস্থা সেই ধনীর মত যার একদিকে কিছু ধন আছে আর একদিকে ঋণও প্রচুর— তার পক্ষে হাল ছাড়িয়া দেওয়াও শক্ত, হাল ধরিয়া থাকাও সহজ নয়। এই সকল কারণেই এক-একবার মনে করি বহু দূরে চলিয়া যাইব— কিন্তু সে সব চেষ্টা মিথ্যা। মনিবের কাছে ছুটি মঞ্জুর না হইলে ঘরেও ছুটি নাই বাহিরেও ছুটি নাই।

আমি যে অনাদর ও আঘাত পাই তাহার মধ্যে আমার কল্যাণ আছে কিন্তু তোমাদের কাছ হইতে মাঝে মাঝে যে স্নিগ্ধ শ্রদ্ধাটুকু পাইয়া থাকি তাহার মধ্যে ঈশ্বরের দয়া অনুভব করি।

এ তাঁহারই প্রসাদ— সেবকের ক্লান্তির সময় তাহাকে পুরস্কারের স্বরূপ পাঠাইয়া থাকেন।

ঈশ্বর তোমার জীবনকে কল্যাণে পূর্ণ করুন সেই কল্যাণ তুমি সংসারে বিতরণ কর। ইতি ১২ই পৌষ ১৩২২

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

ওঁ

পতিসর
আত্রাই

কল্যাণীয়াসু

এবারে নানা উপদ্রবে আমার শরীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছে বলে কিছুদিনের জন্যে শিলাইদহে পদ্মার চরে আশ্রয় নিয়েছিলুম। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে একটি ছোট নদীর ধারে এই ছোট গ্রামটিতে এসে পৌঁচেছি। এখানে আমার কিছু কাজ আছে সেইটে শেষ করেই কলকাতায় যাব। বোধ হয় আসচে সপ্তাহের গোড়াতেই গিয়ে পৌঁছব।

১১ই মাঘে তুমি আমাদের বাড়িতে এসেছিলে— দেখা হতে পারলে খুব খুসি হতুম।

তুমি কখন কোথায় থাক জান্‌তে পারি নে বলেই আমার বই তোমাকে পাঠাতে পারি নে। এবারে কলকাতায় ফিরে গেলে আমাকে একটু মনে করিয়ে দিয়ো— কোন্ কোন্ বই চাও তাও লিখো। অনেকদিন থেকে আমার বিশেষ কোনো বই বেরয় নি— সবুজ পত্র বলে একটা কাগজে প্রায় লিখে থাকি।

অবসাদটাকে কাটিয়ে ফেলবার জন্যে এবার ইচ্ছা করচি দেশ ছেড়ে কোথাও সমুদ্রতীরে বেরিয়ে পড়ব। চিরকাল আমি এমনি করে ঘুরে বেড়িয়েছি ঘুরতে ঘুরতেই একেবারে

বেরিয়ে পড়ব।

আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি ১১ ফাল্গুন ১৩২২

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২

১৫ এপ্রিল ১৯১৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, তুমি আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

তোমার চিঠি পড়ে অনেকবার আমার এই কথা মনে হয়েচে যে, মুক্তিকে তুমি ভয় কর এবং বন্ধনকে তুমি আশ্রয় মনে করেচ। এই জন্যেই একটা আবরণের থেকে আর একটা আবরণের মধ্যে যাবার জন্যে তোমার আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। নির্ম্মুক্ত মনে সত্যকে তার নির্ম্মল স্বরূপে গ্রহণ করবার সাধনাতেই মানুষ যথার্থ শক্তি পায়। অর্থাৎ মানুষের মধ্যেই সেই শক্তি সত্য যে সত্য নিজের আলোকেই আত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার পরমাত্মার অবাধ যোগ উপলব্ধি করে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। নিজের মনকে এবং অন্যের মনকে দুর্ব্বল করবার অভ্যাস কোরোনা। সাহস করে নিজের মহৎ অধিকারকে স্বীকার কর। চৈতন্যকে আবৃত করে বুদ্ধিকে খণ্ডিত করে আত্মাকে চিরদিন বঞ্চিত কোরোনা।

আমি কাল রবিবারে কলকাতায় যাব। সেখান থেকে শীঘ্রই সিংহলের পথে জাপান হয়ে আমেরিকায় যাবার আয়োজন করচি।

ছোট ছেলেকে শিক্ষার প্রণালী কোনো বই থেকে পাবে না। আমি ছেলেদের বই দেখে শেখাই নে। মুখে বলে', বলিয়ে

নিয়ে, এবং লিখে লিখিয়ে তাদের গ্রহণ করবার এবং প্রকাশ করবার শক্তিকে জাগিয়ে তুলি। সে প্রণালী অত্যন্ত সহজ বলেই শক্ত।

দুই বৎসরের পূর্ব্বে আমার ফেরা হবেনা এই রকম মনে করচি। তোমাদের মঙ্গলকামনা এবং শ্রদ্ধা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে আমি যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে চল্লুম। ইতি ২রা বৈশাখ ১৩২৩

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩

২৯ এপ্রিল ১৯১৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আগামী সোমবার রাত্রে জাহাজে উঠ্‌ব। প্রথমে জাপানে যাব তার পরে কোথায় সে পরে স্থির হবে।

এ দেশ ছেড়ে সহজে দূরে যেতে ইচ্ছা হয় না— ঘুরে বেড়াবার বয়সও নয়। কিন্তু আমি ঘরের মানুষ নই অতএব আমি স্থির হয়ে ঘরে বসব এ কথা হাজার ইচ্ছা করলেও সে ইচ্ছা পূর্ণ হবেনা। যেখানে আমার ডাক পড়ে সেখানে আমাকে যেতেই হবে। আমাকে যদি দরকার না থাকত তাহলে কখনই আমার যাওয়া ঘটত না। আমি যাবনা যাবনা করেই এতদিন কাটিয়েছি। নানা ছুতোয় এইখানেই রয়ে গেছি কিন্তু শেষকালে টেনে নিয়ে চল্ল। আমি পথিক এ কথা আমাকে মান্‌তেই হবে। আজ বুঝেছি পথই আমার স্বদেশ— এই পথই গ্রহ নক্ষত্রের ভিতর দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছে— অতএব কোথাও গুছিয়ে বসবার জন্যে আসবাব জড় করা আমার পক্ষে মিথ্যা।

অতএব তোমাদের কাছে আমার আশীর্ব্বাদ রেখে আমি যাত্রা করচি। ইতি ১৬ বৈশাখ ১৩২৩

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪

২২ মার্চ ১৯১৭

ওঁ

শান্তিনিকেতন

পরমকল্যাণীয়াসু

মাতঃ তোমার পত্র পাইয়া খুসি হইলাম।

শরীর আমার ভালই আছে। আপাতত এইখানেই স্থির হইয়া বসিলাম। কিন্তু আবার কখন তলব আসে কিছুই বলা যায় না। আমার গণ্ডি ঘুচিয়াছে কাজেই দেশে দেশে আমাকে ফিরিতে হইবে— ঘরে আমার বাসা রহিলনা। কাজ যদি আমারই হইত তবে অনেকদিন পূর্ব্বেই কাজ শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু প্রভুর কাজ— তাহার শেষের খবর কিছুই জানিনা।

আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ৯ চৈত্র ১৩২৩

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৫

১৮ এপ্রিল ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বর্ষারম্ভে অন্তরের সহিত আমি তোমার কল্যাণ কামনা করি।

আমার পক্ষে বিশ্রামের বিশেষ দরকার হয়েচে। সেইজন্যে কিছুদিন থেকে লেখা ছেড়ে দিয়েচি— লিখ্‌তে ইচ্ছাই হয় না। কিন্তু আমার শরীরের জন্য উদ্বেগের বিশেষ কোনো কারণ নেই। এই মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের বিদ্যালয়ের অবকাশের সময়ে কোনো একটি নিভৃত জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেব এই রকমের ইচ্ছা আছে। ইতি ৫ই বৈশাখ ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৬

২৪ জুন ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছু দিন দার্জ্জিলিঙে ছিলাম। শরীর ভাল ছিল না। আমার বড় মেয়ে মাধুরীলতাকে ক্ষয়রোগে ধরিয়াছে। সেই জন্য উদ্বিগ্ন আছি। বোধ করি কিছুকাল কলিকাতায় থাকিতে হইবে অথবা বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য তাহাকে লইয়া অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন হইবে। ইতি ১০ আষাঢ় ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭

বড়োবাজার

* ৩ জুলাই ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি যদি আসতে পার তবে আনন্দিত হব। আমি দিনের বেলাটা আমার মেয়ের বাড়িতেই থাকি। সন্ধ্যা ছটার পরে আমার সময়। কিন্তু কাল বুধবারে অন্যত্র কাজ আছে। বৃহস্পতিবারে কিছুদিনের জন্য বোলপুরে যাব। কাল সকাল বেলায় বাড়ি থাকব— বেলা একটার পর বেরব। অতএব যদি তোমার অসুবিধা না হয় তবে সেই সময়ে আসতে পার। ইতি মঙ্গলবার

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৮

হ্যারিসন রোড

৩০ জুলাই ১৯১৭ *

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি কিছুকাল থেকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত আছি অথচ কর্ম্মের ব্যস্ততা কিছু কমে নি, তা ছাড়া আমার মেয়ের অসুখে মন উদ্বিগ্ন আছে। এই কারণেই তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে পারিনি। মাঝে কয়েক দিন শিলাইদহে ছিলাম সেখানেও বিশ্রামের সুযোগ পাই নি। ইতি ১৪ই শ্রাবণ [১৩২৪]

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৯

বড়োবাজার

* ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ কর্ম্মের জাল জটিল ও কঠোর হয়ে আমাকে ঘিরেচে, তার উপরে মনের উদ্বেগ আছে তাই তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে সময় পাই নি। সোমবারে সন্ধ্যা ছটার পর কোনো একসময়ে যদি আমাদের এখানে এস তাহলে আমাকে বাড়িতে পাবে। ইতি রবিবার

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫০

২৭ অক্টোবর ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখন শান্তিনিকেতনে আছি। কলকাতায় গেলে সেই ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিয়ো। এখানে এলে অসুবিধা হবে। ব্যস্ত আছি। বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবে। ১০ কার্ত্তিক ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১

৩ নভেম্বর ১৯১৭

ওঁ　　　　　　　　　　শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

হেমন্তকে যে জমি দিবার কথা বলিয়াছিলে এখান হইতে তাহার কোনো ব্যবস্থা সম্ভবপর নহে। কারণ বিষয়কর্ম্মের ভার আমার হাতে নাই, তাহা আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। শিলাইদহে গেলে সেখানে জমির তদন্ত করিয়া সদরে ভারপ্রাপ্ত কার্য্যাধ্যক্ষকে অনুরোধ করিয়া চেষ্টা দেখিতে পারি। ইতি ১৭ কার্ত্তিক ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২

২২ নভেম্বর ১৯১৭

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

আমার শরীর কিছুকাল থেকে ভেঙ্গে পড়েচে অথচ কর্ম্মের ভারও বেশি হয়েচে এই জন্য চিঠিপত্র লিখ্‌তেও ত্রুটি হচ্চে। ডাক্তার আমাকে অবিলম্বে কলকাতা ছেড়ে এবং কাজ ছেড়ে পালাতে বলেচেন কিন্তু আবদ্ধ হয়ে আছি— এখনো নড়তে পারচি নে। যত শীঘ্র পারি শান্তিনিকেতনে চলে যাব কিন্তু কবে ঘট্‌বে এখনো জানি নে। ইতি ৬ অগ্রহায়ণ ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৩

৩০ নভেম্বর ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ক্লান্তির বোঝা লইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া পালাইয়া আসিয়াছি। আশা করিতেছি কিছুদিন এখানে পড়িয়া থাকিলে সুস্থ হইয়া উঠিব। ইতি ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪

৯ জানুয়ারি ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

সুখদুঃখের ঢেউ কাটিয়েই ত আমাদের জীবন বেয়ে নিয়ে চল্‌তে হবে। এই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হবে সেই ঘটনা-গুলোই চরম সত্য নয়। ব্যথা এড়াব এমন সাধ্য আমাদের নেই কিন্তু তাকে সত্যরূপে গ্রহণ করব এটা আমাদের সাধনার অঙ্গ। যিনি চিরন্তন তাঁকে যদি দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে মনের মধ্যে রাখ্‌তে পারি তাহলে যা চঞ্চল সে আমাদের আর আঘাত করতে পারে না। আমরা নিজেকে যখনই বড় করে দেখি তখনি নিজের ভার অত্যন্ত বেড়ে ওঠে— তখনি দুঃখসুখের ঢেউ জীবনকে বড় বেশি তোলপাড় করে তোলে।— নিজেকে এবং প্রতিদিনের সমস্ত তুচ্ছতাকে নিজের সত্য-আপন থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে দূরে রেখে দেখ্‌লে জীবনযাত্রা সহজ হয়। যে দুঃখে আমরা মরি সে আমাদের নিজের হাতের মার। তার মানে এ নয় যে সেই দুঃখের ঘটনা আমাদের নিজের সৃষ্টি, তার মানে এই যে, সেই ঘটনাকে আঘাতস্বরূপে নেওয়া আমাদের নিজেরই কাজ।

আমি বোধ হয় জানুয়ারি মাসের শেষ তারিখে কলকাতায় যাব। ইতি ২৫ পৌষ ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার শরীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত আছে। কলিকাতায় শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করি না। সেখানকার ভিড় এবং নানা প্রকার দায় আমাকে অত্যন্ত বেশি ক্লিষ্ট করে। যদি ইতিমধ্যে যাইতে হয় তোমাকে সংবাদ জানাইব।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ২২ মাঘ ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬

শান্তিনিকেতন

* ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শরীর ভাল নেই। আমার পক্ষে ভালই হয়েচে— ছুটি মিলেচে। তবু এখনো কাজের এবং লোকের ভিড় যথেষ্ট আছে। যাই হোক্ এমনি করে ছাড়া বোঝা হাল্‌কা হবে না।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭

১৩ মার্চ ১৯১৮

ওঁ কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

আমার কন্যার পীড়া বাড়িয়া উঠাতে শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইয়াছে। আমার শরীর এখনো ক্লান্তিভারে পীড়িত আছে। ইতি ২৯ ফাল্গুন ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৮

বড়োবাজার

* ২১ মার্চ ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি সন্ধ্যার পর প্রায়ই বাড়িতে থাকি। তুমি যেদিন খুসি আস্‌তে পার। কাল শুক্রবারে যদি আস ত দেখা হবে। ইতি বৃহস্পতিবার

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৯

বড়োবাজার

* ২০ এপ্রিল ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যাবার উদ্যোগে ব্যস্ত আছি। আমাদের জাহাজ আগামী ২১শে বৈশাখে ছাড়বে। কিন্তু এ জাহাজ কেবল সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত যাবে। তার পরে কবে জাহাজ পাওয়া যাবে এবং সে জাহাজ কতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছবে কিছুই ঠিকানা নেই। আপাতত আর কিছু নয়, সমুদ্রে ভেসে পড়তে পারলেই আরাম পাই। শনিবার

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬০

হ্যারিসন রোড

২৫ এপ্রিল ১৯১৮ *

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর আসিলে দেখা হইতে পারিবে। ইতি বুধবার

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬১

১২ মে ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হবার পর বিশেষ ব্যাঘাত ঘটাতে আমার আর যাওয়া হল না। যদি পথ খোলসা পাই ও জাহাজে জায়গা থাকে তবে সম্ভবত অগস্ট মাসে যাওয়া হতে পারে। কিন্তু আপাতত সমস্ত অনিশ্চিত। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬২

বড়োবাজার

* ১৮ মে ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, আমার প্রকাশকের নিকট সংবাদ লইয়াছিলাম তিনি তোমাকে অনেক দিন হইল্ আমার আদেশ পাইয়াই অনেকগুলি বই পাঠাইয়া দিয়াছেন— আমি তখন বোলপুরে ছিলাম। তোমাদের বাড়িতে ভাল করিয়া খবর লইয়া দেখিবে। যদি সেখানে কাহারো হস্তগত হইয়া না থাকে তবে নিশ্চয়ই ডাকের লোকে ডাকাতি করিয়াছে। যাহা হউক আমাকে সংবাদ্ দিয়ো।

নির্ঝরিণী তাহার স্বামীগৃহে চিত্তের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আছে শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। তাহাকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাইয়ো। সে সংসারকে কল্যাণে পূর্ণ করিয়া জীবনকে সার্থক করুক, সকলের সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠুক্! সংসারযাত্রায় তাহার মঙ্গল সংবাদ যখনি পাইব তখনি আমি আনন্দ লাভ করিব।

শিলাইদহে ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়াছি। আবার পরশ্ব বোলপুরে যাইব। কলিকাতার গোলেমালে মনটা ব্যস্ত হইয়া আছে।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৩

১৬ জুলাই ১৯১৮

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমি ভালই আছি। কিন্তু আজকাল বিদ্যালয়ের কাজে আমাকে সমস্ত দিনই নিযুক্ত থাকিতে হয়, সেইজন্য অন্য কিছুতে মন দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। আমেরিকায় যাইবার জন্য টিকিট কিনিয়াছিলাম। সে টিকিট ফিরাইয়া দিয়াছি। কেননা আমি দেখিলাম, ছেলেদের যে কাজ লইয়াছি সে কাজ ফেলিয়া যাওয়া আমার পক্ষে কর্ত্তব্য হইবেনা। জাহাজে যখন পা বাড়াইতে যাইতেছিলাম এমন সময় এইখানেই ডাক পড়িল। এখন হুকুম মিলিলনা। ইতি ৩২ আষাঢ় ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৪

বড়োবাজার

* ১০ অক্টোবর ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কলিকাতায় এসেছি। সম্ভবত পশু শনিবারে মাদ্রাজের দিকে যাব। ছুটির সময় আশ্রমে থাক্‌তে পারলুম না— দরকার পড়েচে তাই যেতে হচ্চে। যদি সময় পাও কোনো সময়ে এসে দেখা করে যেয়ো। কাল সন্ধ্যার সময়ে বাড়িতে থাক্‌ব। মধ্যাহ্নেও কোথাও বেরবার সম্ভাবনা নেই। ইতি বৃহস্পতিবার

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৫

১৯ নভেম্বর ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মীরা এবং তার ছেলের কঠিন পীড়া হয়েছিল। কিছুদিন হল রোগমুক্ত হয়েচে। রথীর সামান্যরকম ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, এখন সুস্থ হয়ে কলকাতা থেকে ফিরে এসেচে। এখানকার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালই। ভজু ভাল আছে। সন্তোষ স্ত্রী পুত্র নিয়ে দেওঘরে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মা বোনরা মুঙ্গেরে। সন্তোষ সস্ত্রীক সপুত্র রোগ নিয়ে এসে বহু দুঃখ ভোগ করে সম্প্রতি সেরে উঠেচেন। তাঁর মা বোনেরা সকলেই মুঙ্গেরে গিয়ে পীড়িত হয়েছিলেন। এখন সেরে উঠেচেন। যাঁরা আশ্রম ছেড়ে অন্যত্র গিয়েছিলেন সকলেই রীতিমত রোগ ভোগ করেচেন। ইতি ৩ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৬

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯

কল্যাণীয়াসু

আমি গেল দুই মাস ধরে দক্ষিণ ভারতে ঘুরে বেড়াচ্চি— কোনো নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা ছিলনা বলে তোমাদের কোনো চিঠি এতদিন পাই নি। অনেকদিন পরে আজ এক তাড়া চিঠির মধ্যে তোমার চিঠি পেলুম। মাঝে মাদুরায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় কিছুদিন শয্যাগত ছিলুম— এখন একটি স্বাস্থ্যকর জায়গায় এসে কিছুদিন বিশ্রাম করচি। আবার পর্শু মাদ্রাজের অভিমুখে যাত্রা করব। সেখান থেকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতে করতে কলকাতার দিকে রওনা হব। দেশে পৌঁছতে বোধ হয় ফাল্গুন শেষ হবে। আমার জন্যে মনে কোনো উদ্বেগ রেখো না। এখন প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেচি। ইতি ১৬ই ফাল্গুন ১৩২৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৭

১৬ এপ্রিল ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মাঝে কাশীতে গিয়াছিলাম। এখনও আমার শরীর সুস্থ হয় নাই। কিছুকাল বিশ্রামের আবশ্যক আছে। আমার বর্ষারম্ভের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ভূমার মধ্যে তোমার চিত্ত শান্তি এবং স্থিতি লাভ করুক। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৮

৯ মে ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখনও আমার শরীরের সেই ক্লান্তি যায় নি— তাই ছুটিতেও এখানেই পড়ে আছি। আমার এই শারীরিক অকর্ম্মণ্যতা আমার পক্ষে দুঃখের কারণ হয় নি। আমি কর্ম্মের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে খোলা জানলার ভিতর দিয়ে আকাশ দেখবার অবকাশ পেয়েচি। আমাদের হাজার রকমের কর্ম্মের প্রয়াস, নিখিলের নিকট-স্পর্শ থেকে আমাদের বঞ্চিত করে— এই বিপুল জগতের মাঝখানে কর্ম্মের পরদা খাটিয়ে অন্ধ হয়ে থাকি। যদি শরীর অসুস্থ না হত তবে এই পর্দ্দা ওঠাবার অবসর কেউ আমাকে সহজে দিত না। তাই আজকাল আমার এই ক্লান্তি আমার অবকাশটি পূর্ণ করে মুক্তির অমৃত পরিবেষণ করচে। আজ থেকে বিদ্যালয়ের ছুটি হল— এ'তে করে আমার ঘরের আরও একটা দরজা খুলে গেল— এখন আমার সমস্ত মনের উপর হাওয়া এসে লাগুক, আলো এসে পড়ুক এই চাই।

ইংরেজি বই সংগ্রহের চেষ্টা করব— ছেলেরা চলে গেছে তাই পুরানো বই ঠিক এখনি পাওয়া শক্ত হবে। তবু খোঁজ করতে বলে দেব। তুমি যদি ছুটির সময় আশ্রমে এসে থাক্‌তে

চাও তোমার কোনো অসুবিধা হবে না— এখন সমস্ত ঘরই খালি। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৯

৮ জুন ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি দু তিনদিনের মধ্যে বোলপুরে চলে যাব। যদি এর মধ্যে এখানে আস্‌তে চাও দুপুর বেলায় এসো— কেননা অন্য সময়ে সর্ব্বদা লোকের ভিড় থাকে। ইতি ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭০

২১ জুলাই ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। কিন্তু কাজ চলে যাচ্চে। কাজের ভারও সম্প্রতি বেড়ে উঠেচে— সে আমার ভালই লাগ্‌চে।

আগামী ১৫ই শ্রাবণে কলকাতায় গিয়ে তার পরের সোমবারে ফিরে আসব। ইতি ৫ শ্রাবণ ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭১

শান্তিনিকেতন

* ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছুদিন থেকে বিদ্যালয় এবং অন্যান্য নানা কাজ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম তাই চিঠি লিখতে অবকাশও পাই নি, মনও ব্যাপৃত ছিল। শরীর আজকাল পূর্ব্বের চেয়ে ভাল আছে। তাই এবারে কোথাও বায়ু পরিবর্ত্তনে যাবার চেষ্টা করবনা। এইখানেই নির্জ্জনে ছুটি কাটাবার চেষ্টা করব। আজ আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি হয়ে গেল। ইতি বুধবার

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭২

বড়োবাজার

* ২৩ জুলাই ১৯২১ ওঁ সোমবার

কল্যাণীয়াসু

অনেকদিন পরে দেশে ফিরেচি। কালই শান্তিনিকেতনে ফিরতে হবে। পুনর্ব্বার যখন কলকাতায় আসব তখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। এই কয়দিন নিতান্ত ব্যস্ত ও ক্লান্ত ছিলাম। শান্তি ও বিশ্রামের জন্যে সহর ছেড়ে পালাচ্চি।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৩

জুলাই ?, ১৯২১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার কাপড়খানি পেয়ে আমি খুব খুসি হলুন, নিশ্চয় ব্যবহার করব। বিদেশ থেকে সম্মান পেয়েচি সত্য কিন্তু টাকা নিয়ে এসেচি কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সম্মান যা পেয়েচি তা আমার দেশেরই জন্যে— নোবেল প্রাইজে টাকা যা পেয়েচি দেশকেই দিয়েচি। আমি দেশের জন্যে কি রকম কাজ করতে চাই তার চিহ্ন বিশ্বভারতীতে কিছু রেখে যাব আশা আছে— তা কোন তর্কের দ্বারা পরিস্ফুট হবে না।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৪

৪ সেপ্টেম্বর ১৯২১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যেদিন তোমাকে চিঠি লিখেছিলেম তার পরদিনেই আমার শান্তিনিকেতনে আসবার দিন স্থির ছিল— এমন সময় লোকের অনুরোধে পড়ে কাজে জড়িয়ে পড়লুম। তাই এবার কিছুকাল কলকাতায় থাকতে হয়েছিল। যে কয়দিন ছিলুম অত্যন্ত ব্যস্ত থাক্‌তে হয়েছিল কিছুমাত্র অবসর পাই নি— তাতে শরীর বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তোমাদের কাউকে যে কোনো একসময় আসতে বলব এমন সময়ও আমার ছিলনা। তুমি যেদিন বর্ষামঙ্গল দেখতে গিয়েছিলে সেদিন যদি কোনোমতে আমাকে খবর দিতে পারতে তাহলে আমি যেমন করে হোক তোমার সঙ্গে দেখা করতুম। বিশ্রাম করবার প্রয়োজন খুবই অনুভব করচি, কাজ করতে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা বোধ হচ্চে কিন্তু কাজের আর অন্ত নেই। চিঠি লেখার কাজও আগেকার চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এবার যখন কলকাতায় যাব তখন আশা করচি তোমার সঙ্গে দেখা করবার সময় পাব। ইতি ১৯ ভাদ্র ১৩২৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৫

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

৪ঠা তারিখে বিদ্যালয় বন্ধ হবে তার পরে যখন তোমার সুবিধা হয় এখানে এলে তোমাদের থাকবার ব্যবস্থা করা সহজ হবে। আমার অসুখ সেরেচে কিন্তু কাজের অন্ত নেই বলে শরীর ক্লান্ত আছে। ইতি ১৪ আশ্বিন ১৩২৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৬

১৩ নভেম্বর ১৯২১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার লেখা ছাপ্‌তে আজকাল একটুও ইচ্ছা করেনা। মণিলাল অত্যন্ত ধরে পড়েছিল বলেই মৌচাকে একেবারে কতকগুলো কবিতা পাঠিয়েছিলুম। তার ফল হয়েচে এই যে, চারদিক থেকে সম্পাদকেরা লেখার জন্যে আমাকে টানাটানি করতে আরম্ভ করেচে। নিজেকে পাঠকসমাজে বা অন্যত্র আমি প্রকাশ করতে চাই নে— আমার এই আশ্রমের কোণে যথাসাধ্য চুপচাপ করে থাকতে চাই— ছেলেদের মধ্যে কাজ করি তাতেই আমি আনন্দ পাই। ইতি ২৭ কার্ত্তিক ১৩২৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করতে হবে কিন্তু ভারতবর্ষ কোনদিন স্বাধীন হবার চেষ্টা করবেনা এমন কথা আমি বলিনি। মহাত্মাজি বলেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই আমরা থাকব এবং সে রকম থাকার ইচ্ছা না করা "religiously wrong" অর্থাৎ ধর্মবিরুদ্ধ। আমি তা বলিনে। আমি বলি, স্বাধীনতা বাইরের কোন একটা ঘটনার উপর নির্ভর করে না; দেশের যে অবস্থা ঘটলে স্বাধীনতার মূল্য সত্য হয়, স্বাধীনতা সত্য হয় সে অবস্থা ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। সে অবস্থা চরকা কেটেও হয় না, জেলে গিয়েও হয় না — তার সাধনা তার চেয়ে কঠিন ও বিচিত্র — তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালের তপস্যা চাই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসা তপস্যা নয়। যে সব কাজে মনের সমস্ত শক্তির দোহন ও দীর্ঘকালের প্রাত্যহিক ত্যাগস্বীকার চাই সে কাজে এখনো আমাদের ছেলেদের কোনো উৎসাহ দেখিনে এখন দেখি তারা কিছুর তীব্র উত্তেজনার নেশায় মেতে থাকতে চায় "[illegible] সম্ভব।" — বিশ্বভারতীতে মেয়েদের সকল রকম শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে — সব বয়সেরই মেয়েরা যোগ দিতে পারে। ইতি ২২ মাঘ ১৩২৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৭

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করতে হবে কিম্বা ভারতবর্ষ কোনদিন স্বাধীন হবার চেষ্টা করবেনা এমন কথা আমি বলিনি। মহাত্মাজি বলেচেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই আমরা থাক্‌ব এবং সে রকম থাকবার ইচ্ছা না করা "religiously wrong" অর্থাৎ ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আমি তা বলি নে। আমি বলি, স্বাধীনতা বাইরের কোন একটা ঘটনার উপর নির্ভর করে না; দেশের যে অবস্থা ঘট্‌লে স্বাধীনতার মূলপত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয় সে অবস্থা ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করাই আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য। সে অবস্থা চরকা কেটেও হয় না, জেলে গিয়েও হয় না— তার সাধনা তার চেয়েও কঠিন ও বিচিত্র— তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালের তপস্যা চাই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসা তপস্যা নয়। যে সব কাজে মনের সমস্ত শক্তির জাগরণ ও দীর্ঘকালের প্রাত্যহিক ত্যাগস্বীকার চাই সে কাজে যখন আমাদের ছেলেদের কোনো উৎসাহ দেখি নে যখন দেখি তারা নিরন্তর তীব্র হৃদয়াবেগের নেশায় মেতে থাকতে চায় "তদা ন সংশে বিজয়ায়, সঞ্জয়।"— বিশ্বভারতীতে মেয়েদের সকল রকম শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েচে— সব বয়সেরই মেয়েরা যোগ দিতে পারে। ইতি ২২ মাঘ ১৩২৮

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৮

বড়োবাজার

* ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি বিলম্বে পেলুম। আজ আর কিছুক্ষণ পরেই সকালের গাড়িতেই বোলপুরে ফিরে যাচ্চি। আবার কিছুদিন পরেই হয় ত আস্‌তে হবে তখন তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারবে। আর যদি ইতিমধ্যে একবার আশ্রমে যেতে পার তাহলে সেখানে তোমার অসুবিধা হবেনা— কারণ মেয়েদের শিক্ষাবিভাগ খুলেচে, দেখে আস্‌তে পারবে। ইতি শনিবার

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৯

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২২

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমাকে ভুল বুঝেচ। দেশ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই করবার নেই এ কথা আমি কখনই বলি নে। কিন্তু উন্মত্ত হয়ে কিছু একটা করাই কর্ত্তব্য এ আমি মানতে পারি নে। সেই মাতামাতির একটা সুখ আছে তা জানি কিন্তু ফল না থাকতে পারে। এখানে একটা গ্রামে আগুন লেগেছিল। অবশ্য, আগুন লাগ্‌লে জল দিয়েই নেবাতে হয়, সকলেই তা জানে, কিন্তু গ্রামে জলাশয় ছিল না। তবু জল জল রবে চেঁচামেচি পড়ে গেল, সেই চিৎকারে আগুন নিব্‌লনা— এবং লোকে অন্য উপায়ের কথা চিন্তা করতেও ভুলে গেল। একজন বিদেশী লোক ছিল সে বল্‌লে যে সব ঘরে আগুন লেগেচে তার চারদিকের ঘরগুলোকে ভেঙে ফেল যাতে আগুন পাড়ায় ছড়িয়ে না পড়ে। গ্রামের লোক এ পরামর্শ শুন্‌তে চাইল না তখন সেই বিদেশী লোক বেত হাতে তাদের জোর করে ঘর ভাঙিয়ে আগুনকে দমন করলে। এখন যেখানে আছি এই ঘটনাটি তার নিকটের পাড়াতেই ঘটেছিল।

অন্য ইতিহাসের নকল করে নিজের দেশের ইতিহাস রচনা করা যায় না।— মনের আক্ষেপ, উত্তেজনা এবং হাঁক ডাক

ব্যাপারটা খুব প্রচণ্ড হতে পারে কিন্তু দেশের অবস্থার সঙ্গে উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য সাধন সে উপায়ে সিদ্ধ হয় না। "দেশে আগুন লেগেচে অতএব ইত্যাদি" এ কথা কিছুকাল থেকে শুন্‌চি— এ আগুন বহু বহু শতাব্দী থেকেই লেগেচে— কিন্তু "আড়ি, আড়ি, আড়ি, আড়ি" বলে চীৎকার করবার জন্যে ছেলেরা লেখাপড়া এবং বুড়োরা কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিলেই এ আগুন নিব্‌বে এ কথা বিশ্বাস করি নে। চরকা চালিয়ে খদর পরে' এই আগুন নিব্‌বে এটা এতবড় একটা ছেলেভোলানো কথা যে, এ কথায় দেশসুদ্ধ লোক ভুলেচে দেখে হতবুদ্ধি ও হতাশ হতে হয়। সন্ন্যাসী বলচে তামাকে সোনা করবার একটা সহজ প্রক্রিয়া আমি জানি, আমি বল্‌চি সোনা যথানিয়মে উপার্জ্জন করতে হবে অন্য কোন প্রক্রিয়া নেই— তখন তুমি যদি আমার উপর রাগ কর তাতে এই প্রমাণ হয় যে, উপার্জ্জন করবার মত উদ্যম তোমার নেই অথচ সোনা পাবার লোভ তোমার পুরো মাত্রায়— এমন মানুষকে বিধাতা পুরস্কার দেন না। চরকা চালিয়ে কোনো ফল হয় না এ কথা কেউ বলে না, তার যেটুকু ফল তাই হয় তার বেশি হয় না। কুইনিন্‌ খেলে ম্যালেরিয়া সারে, ম্যালেরিয়া সারলে দেশের পরম উপকার ঘটে, কিন্তু কুইনিন খেলে স্বরাজ হয় এ কথা কুইনীন বিক্রির মহাজনও বলে না।

মেয়েদের শিক্ষাসম্বন্ধে তোমার সঙ্গে অবসরমত কোন এক সময়ে আলোচনা করব। ইতি ১৬ ফাল্গুন ১৩২৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮০

বড়োবাজার

* ২১ মার্চ ১৯২২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কয়েকদিন কলকাতায় এসেচি। বৃহস্পতিবার রাত্রে শিলাইদহে যাব। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেছিলে। বুধবার বা বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে যদি আসতে পার দেখা হতে পারবে। ইতি মঙ্গলবার

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮১

শান্তিনিকেতন

* ২৮ এপ্রিল ১৯২২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ক্রমে আমার কাজও বাড়চে বয়সও বাড়চে— সেই জন্যে যেদিকে কাজ সংক্ষেপ করা চলে সেদিকে যথাসাধ্য অবকাশ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে থাকি। তোমরা যে সব প্রশ্নের উত্তর চিঠিতে আমার কাছ থেকে আদায় করতে চাও সে সব প্রশ্নের জবাব মিল্‌বে না। আগে প্রায় সকল চিঠিরই উত্তর সকলকেই দিতুম এখন আর তা চলে না। কারণ চিঠির সংখ্যা বেড়েচে, শক্তির পরিমাণ কমেচে, এখন আমার ছুটির সময় এসেচে। এই কারণেই চিঠিতে তোমাকে সব কথা বড় করে লিখ্‌তে পারি নে। সে জন্যে কিছু মনে কোরোনা। বিদ্যালয়ের ছুটি আরম্ভ হয়েচে —বোধ হয় আমার ছুটি এইখানেই কাটবে। ইতি শুক্রবার

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮২

বড়োবাজার

* ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কলকাতায় যথেষ্ট বড় হল না থাকাতে স্থানাভাবে মেম্বর নেওয়া বন্ধ করতে হয়েচে। আমার যেবার বক্তৃতা করবার থাকবে আমাকে জানালে আমি তোমার টিকিটের ব্যবস্থা করে দেব। আমি শারদোৎসব অভিনয়ের পরে বম্বাই ও মাদ্রাজ হয়ে সিংহলে যাবার ব্যবস্থা করেছি। বিশ্বভারতীর নানা কাজে উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত থাকাতে ক্লান্ত আছি। ইতি শনিবার

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৩

২৮ এপ্রিল ১৯২৩

ওঁ   কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

কিছুকাল আমি সিন্ধু, কাঠিয়াবাড়, বম্বাই প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করছিলুম। খুব ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেচি। এখন শিলং পাহাড়ে কিছুকাল বিশ্রামের জন্যে যাব ঠিক করেচি।

আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি হয়ে গেছে। জ্যৈষ্ঠমাসে যদি সেখানে কিছুদিন গিয়ে থাকতে চাও তাহলে স্থানের অভাব হবে না। তুমি সন্তোষ মজুমদারকে জান, তাঁকে চিঠি লিখ্‌লেই জায়গার ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু জ্যৈষ্ঠমাসে শান্তিনিকেতনে অসহ্য গরম হয়, প্রায় পশ্চিম প্রদেশের গরমের মত।

তুমি শান্তি লাভ কর, আনন্দ লাভ কর এই আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। সংসারের অতি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে একান্ত বদ্ধ আছ বলে আপনার ভিতরকার সান্ত্বনার পথ খুঁজে পাও না। যে বৃহৎ ক্ষেত্রে মানুষ পূর্ণভাবে আপনাকে দিয়ে ফেলতে পারে সেইখানেই মানুষ বাঁচে। যেখানে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের বাধা সেইখানেই মানুষ বন্দী। ইতি ১৫ বৈশাখ ১৩৩০

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৪

৮ অগস্ট ১৯২৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার অসুখ সেরে গেছে। কিন্তু দুর্ব্বলতা এখনো যেন সমস্ত দেহ আঁকড়ে আছে। দেহমনের এই অবসাদ দূর হতে বোধ হয় কিছুদিন যাবে। ইতি ২৩ শ্রাবণ ১৩৩০

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৫

২৬ অক্টোবর ১৯২৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। আমি দুই মাসের জন্য ভিক্ষাব্রত লইয়া বোম্বাই গুজরাট কাঠিয়াবাড় প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণে বাহির হইতেছি। ইতি ৯ কার্ত্তিক ১৩৩০

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৬

২৩ এপ্রিল ১৯২৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছুকাল থেকে আমার শরীর একটু বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েচে তাই নড়াচড়া বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছি। আর একটু বল পেলে য়ুরোপে যাবার কথা আছে— সেখানকার জলবাতাস ও চিকিৎসায় হয় ত আরোগ্যলাভ করতে পারি।

শরীরের অস্বাস্থ্য উপলক্ষ্যে যে ছুটি পেয়েছি সেই ছুটি আমার অনেক কাজে লেগেচে। অনেকদিন পরে বিশ্বের অন্তঃপুরে মন আপন আসন পেতে বস্‌তে পেরেচে।

তুমি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ১০ বৈশাখ ১৩৩২

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৭

৪ নভেম্বর ১৯২৫

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

দীর্ঘকাল থেকে আমি পীড়া ভোগ করচি। কবে নিষ্কৃতি পাব জানি নে। একটা সুবিধা এই যে, কর্ম্মের ভীড় থেকে খানিকটা ছুটি পাই, তাতে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার সুবিধে হয়— তা ছাড়া, বাহিরের বিশ্বেও মনটাকে মুক্তভাবে ছাড়া দেবার অবকাশ ঘটে। অন্তরের মধ্যে নিবিষ্ট হওয়া হচ্চে পরিণত বয়সের ধর্ম্ম, আর বাইরের আকাশে ছুট্ দেওয়া হচ্চে ছেলেবয়সের ধর্ম্ম— এই দু দিকের দরজাই আমার খুলে গেছে সেই জন্যে কোনোরকম কাজ করতে এখন আর ভালো লাগে না, অথচ কাজেরও সম্পূর্ণ বিরাম নেই। ডাক্তারের শাসন থেকে যদি ছাড় পাই তাহলে আর দু চার দিন পরেই শান্তিনিকেতনে চলে যাব। ইতি ১৮ কার্ত্তিক ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৮

১৭ এপ্রিল ১৯২৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পড়ে আমার মনে বড় বাজল। তুমি মনে করেছিলে তোমার আত্মাকে তৃপ্ত করবার মত কোনো সম্পদ আমার আছে। কিন্তু আমি পথের পথিক, গম্যস্থানের ডাক শুনি ; ঠিকানায় পৌঁছে কাউকে জোর করে ডাক দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। আমার আছে বলবার ক্ষমতা, তাই বিধাতা আমাকে দিয়ে নানা কথাই বলিয়ে নেন— কোনো একটি বাণীতে আমার সকল বাণী সংহত করে সাধনার মন্দিরে আলো জ্বালবার কাজে আমার তলব পড়ে নি। আমি গুরু না, রাষ্ট্রনেতা না,— আমি কবি, সৃষ্টির বিচিত্র খেলায় নানাছন্দে গড়া খেলনা জোগাব, এই আমার কাজ। তাতে মানুষের যেটুকু আনন্দ সেইটুকুতেই আমার সার্থকতা। এই আমার স্বধর্ম্ম, আর সেই স্বধর্ম্মরক্ষার দায়িত্বই আমার। আমার কাছ থেকে রাষ্ট্রনৈতিক সুবুদ্ধি, কর্ম্মনৈতিক নৈপুণ্য যারা আশা করেছে তারা নিজে ভুল করেছে, অথচ আশাভঙ্গের দুঃখের জন্যে আমাকেই দায়ী করেছে। একদিন তুমি যখন আমাকে নানা সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলে তখন আমার মনের ভিতর থেকে তার উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি, কেননা সেটা আমার কাজ। সেই জন্যে এ কাজে ডাক পড়লে আমাকে সাড়া দিতেই হয়। কিন্তু শুধু

কথার মধ্যে যেটুকু বুদ্ধি, যেটুকু ভাব থাকে তাতে আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়ের কিছু তৃপ্তি হতে পারে, আত্মার আশ্রয় তাতে সম্পূর্ণ হয় না। সেই আশ্রয় যাঁরা দেন তাঁরা আর একশ্রেণীর মানুষ— যে বিধাতা খেলা করেন সেই বিধাতার সাথী তাঁরা নন্, যে বিধাতা বিধান করেন সেই বিধাতার দৌত্য তাঁদের হাতে।

তোমার যে চিঠিগুলি সেদিন আমি পেয়েছিলুম, তার মধ্যে তোমার একটি সহজ বুদ্ধি ও ভাবের গভীরতা দেখে আমি আনন্দিত ও বিস্মিত হয়েছিলুম। সেই কারণেই আমি বিশেষ শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গেই তোমাকে উত্তর লিখেছি। এখনকার চেয়ে তখন আমার হাতে সময় বেশি ছিল— শরীরও সুস্থ ছিল— তোমার কথা বিশেষভাবে মনে রেখে তোমাকে আমার চিন্তার দ্বারা যথাসাধ্য সাহায্য করায় আমার আনন্দ ছিল। আমি খুব অল্প মেয়েকেই জানি, যে তোমার মত এমন সংযতভাবে সুস্পষ্ট ভাবে ও একাগ্রভাবে চিন্তা করতে ও চিন্তা গ্রহণ করতে পারে। আমি জানি আমার অনেক কথাই তোমার আজন্ম-সংস্কারের প্রতিকূল ছিল। অন্য কেউ হলে ক্ষোভে, এমন কি, অবজ্ঞায় সে সব কথা প্রত্যাখ্যান করত। কিন্তু তুমি ব্যথিত হয়েও আমার কথা স্থিরভাবে বোঝবার সহিষ্ণুতা কখনো হারাও নি। কোনোদিন তোমাকে আমার মতে আনব একথা কখনই ভাবি নি— সব দিক থেকে সকল কথা ভেবে নেবার পক্ষে তোমার মনে কোনো বাধা না থাকে এইটেই আমার ইচ্ছা ছিল। যাঁরা গুরু তাঁরা নিজের বিশ্বাসের জোরে নিজের মতে সবাইকে প্রবর্তিত করতে

চান— যে কবি সে কেবল মনের ভাবকে সাজিয়ে দিয়ে চলে যায়, গতিয়ে দেবার গরজ তার নেই। পথিক তার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিজের পথেই চলে যায়, যদি একটুখানি খুসি হয়ে যায় তাহলেই হোলো। তোমার চিঠি পড়ে মনে হচ্চে, তোমাকে কিছু আনন্দ দিয়ে থাকব— সেটাতে হয় ত ধরে রাখবার মত কিছুই নেই— সে যেন এক পসলা বৃষ্টির মত, পান করবার পাত্রভরা তৃষ্ণার জলের মত নয়। তোমার প্রয়োজনের স্থায়ী সম্বল যদি তোমাকে দিতে পারতুম তবে আজ তোমার শক্তির অবসানের মুখে তাই তোমার পাথেয় হতে পারত— কিন্তু খেলা নিয়েই যার চির জীবনের কারবার তার হাতে কেবল রঙের জিনিষই থাকে, মূল্যের জিনিষ কিছুই থাকে না।— তবু আমি জানি তোমার নিজের ভিতরেই যে শক্তি আছে, অনেকদিন থেকে সেই শক্তিই তোমার পথ ভিতরে ভিতরে কেটে আস্‌চে, সুখে দুঃখে আশায় নৈরাশ্যে। তোমার সেই শক্তি আজ পরম সার্থক হোক এই আমার অন্তরের কামনা। ইতি ৪ বৈশাখ ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৯

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পড়ে খুসি হলুম। আমি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি তোমার ভাববার ও ভাব প্রকাশের শক্তি সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি। এই কারণেই, যখন আমার সময় ছিল, তোমাকে যত্ন করে অনেক চিঠি লিখেছি— জানতেম তুমি তা বুঝবে এবং তাতে তোমার নিজের চিন্তার উদ্যম উদ্বুদ্ধ হবে। এখন আমার জীবনের সায়াহ্ন; আমার ভাবনা কল্পনা যা কিছু একদিন বাইরে সঞ্চরণ করতে বেরিয়েছিল তারা সব ভিতরে ফিরে এসেছে— তাই চিঠির গণ্ডূষও ভরতে চায় না।

তোমার মধ্যে যে শক্তি আছে তাকে তুমি নিরুদ্ধ করে কেন রাখ? অন্তত তাকে নিজের কাছে প্রকাশ করতে পারলেও তোমার উপকার হবে। প্রকাশের দ্বারাই নিজের কাছ থেকে নিজে আমরা লাভ করি— আমাদের পক্ষে সেই লাভ সকলের চেয়ে সত্য। গাছ আপনার ফলফুলপল্লব বিকাশের দ্বারাই আপন সম্পদ পায়— বাইরে থেকে তার ডালে বহুমূল্য জিনিষ ঝুলিয়ে দিলে সে তার পক্ষে ভার হয় মাত্র।

আত্মীয়ার বিবাহ উপলক্ষ্যে আজ কলকাতায় এসেছি কাল বোলপুরে ফিরে যাব। ইতি ৪ ফাল্গুন ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯০

১৬ এপ্রিল ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে সুখী হলুম, সেই সঙ্গে মনে উদ্বেগ বোধ করচি। তোমার শরীর নিশ্চয় ক্লান্ত, তাই প্রাণশক্তির ম্লানতায় তোমার মনের মধ্যে অবসাদ আসচে। এই ম্লানতায় মাকড়ষার জালের মতো আমাদের জড়িয়ে ফেলে— বিশ্বের সঙ্গে আমাদের অনেকখানি বিচ্ছিন্ন করে দেয়— সবটা আলো আমাদের দৃষ্টিতে পোঁছয় না, সবটা হাওয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে নিঃশ্বসিত হতে পারে না। ক্ষীণ জীবনের জীর্ণ শিকড়গুলো অস্তিত্বের সব রস পূরোপূরি শুষে নিতে জোর পায় না। তোমার সঙ্কল্পের আবেগের সঙ্গে তোনার প্রাণশক্তি-দৈন্যের অসামঞ্জস্য ঘটেচে সেই জন্যে এত বেশি কষ্ট পাচ্চ। তোমার অন্তরে বাহিরে ভালো রকম মিল হতে পারচেনা। ন্যূনাধিক পরিমাণে এই অসামঞ্জস্য সকলেরই জীবনে আছে। এই অসামঞ্জস্যের আঘাতের প্রয়োজনও গুরুতর। মাটি উঁচু নীচু, এবং ভিন্ন স্থানে তাপমাত্রার ভিন্নতা বশতই পৃথিবীতে জলের ধারা চলে, বাতাস বয়। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে অসাম্য আছে বলেই আমাদের চিত্তপ্রবাহ আঘাতে অভিঘাতে সর্ব্বদা জাগরিত। অথচ এই অসাম্য অতিশয় অতিরিক্ত হলে তাতে আমাদের শক্তিকে নিরস্ত করে, উদ্দীপিত করেনা। এ

কথা এত করে এই জন্যে বলচি, যে, সম্প্রতি কিছুদিন থেকে অবস্থার দৈন্য, কর্ম্মের বাধা, শরীরের দুর্ব্বলতায় আমার জীবনেও একটা ঔদাস্যের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু সেটাকে চরম বলে স্বীকার করে নিতে পারিনে। সেটা মায়া-জাল, তার থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে চাই। ছায়াকে সত্য বলে জানা ভূতের ভয় পাওয়ার মত— যেই বল্‌তে পারব সেটা মিথ্যে, অম্‌নি তার জোর চলে যাবে। অবসাদের উপছায়াটাকে বার বার বোলো, মিথ্যা, মিথ্যা— তোমার যে-আত্মা সত্য তাকে নিত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলে নিশ্চিত জানো, প্রতিদিনের আঘাত জর্জ্জরতা কেটে যাক্। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯১

২৯ মে ১৯২৭

ওঁ

Uplands
Shillong

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। সরসীবাবু কবিতাকে যেদিক থেকে যাচাই করতে চান সেদিক দিয়ে সজীব কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় না। বন্ধুকে যদি শরীরতত্ত্বরূপে বিচার করি তবে শরীরতত্ত্ব মিলতেও পারে কিন্তু বন্ধু থাকেন কোথায়? কবিতার পরিচয় তার রসে, সেটাকে পাই স্বাদের দ্বারা, বিশ্লেষণের দ্বারা নয়। প্রথমে তাল, তার পরে গান, তার পরে গতি, কবিতার এ পর্য্যায়ের কোনো মানেই নেই। সমস্তটা জড়িয়ে ও একটা অখণ্ড জিনিষ। একটা নদী চল্‌চে তাকে আমরা ভাগ ভাগ করে বল্‌তে পারি নে, আগে তার ঢেউ, তার পরে তার জল, তার পরে তার ধারা— ওর এক-সঙ্গেই সব।

আমাদের জীবনের ক্ষেত্র ছোটো, তার উপকরণও সীমাবদ্ধ —সেই ক'টিকে নিয়ে সেইটুকুর মধ্যে একটি মূর্ত্তি সাজিয়ে তুল্‌তে হবে। সুখ দুঃখ জিনিষটা চরম জিনিষ নয়, তারা উপাদানমাত্র, তাদের নিয়ে একটি সুসঙ্গতির মধ্যে গুছিয়ে তুলে জীবনটাকে রূপ দিতে হবে। নিজের জীবন রচনায় আমরা আর্টিস্‌ট্। যদি তাকে একটি সুষমা দিতে পারি

তাহলেই যিনি নিত্য আমাদের জীবনে তাঁর প্রকাশ হয়। রেখা রঙ নিয়ে এলোমেলো আঁক কাট্‌লেই ছবি হয় না— তাদের মিলিয়ে নিয়ে যখন রূপ ফুটে ওঠে তখন সেই রূপ নিত্যতা লাভ করে। ছবি আঁকতে হলে এমন কোনো ভাবকে গ্রহণ করতে হয়, যে ভাবের মধ্যে পূর্ণতার রস আছে, সেই মূল ভাবের অনুগত করে রেখা ও রঙের বিন্যাস সাধন করা চাই। নিজের জীবনের সম্বন্ধেও তাই, সমস্ত সুখ দুঃখ সমস্ত চাওয়া পাওয়া যদি এলোমেলোভাবে থাকে তাহলে সৃষ্টি হল না— কোনো একটি চিরন্তন ভাবের সঙ্গে সঙ্গত করে তাদের শান্তি সৌন্দর্য্য ও সম্পূর্ণতা দিতে হবে— জীবনের অর্থ হল এই। ইতি ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯২

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। প্রত্যেক বীজ আপনার বিকাশের খাদ্য আপনার মধ্যেই ধরে রাখে— সেই খাদ্যটুকুর মধ্যেই তার ভাবীকালের প্রাণসঞ্চয়। উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলেই সে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। আমাদের আত্মার অমৃত অন্ন আত্মারই গভীর কেন্দ্রে নিহিত— আত্মসমাহিত শান্তির মধ্যে তাকে পাওয়া যায়। এখন তুমি যে শান্তির মধ্যে মগ্ন হবার অবকাশ পেয়েচ সেই শান্তির গভীরতাতেই তুমি আপনার বাণী আপনি পাবে। মঙ্গলকর্ম্মের মধ্যেও এই শান্তি পাওয়া যায়, কিন্তু কর্ম্মকে সম্পূর্ণ অহংমুক্ত করা বড় কঠিন। কর্ম্মশালার জালনা দরজা যত বড়ই হোক্ তবু তার মধ্যে বদ্ধতা থেকে যায় এইজন্যে কর্ম্মশালার বাইরে খোলা বাগানের দরকার হয়, যাঁরা কর্ম্মসন্ন্যাসী কর্ম্মের চক্রবাত্যায় আত্মার বাণীকে হারিয়ে ফেলবার আশঙ্কা তাঁদের যথেষ্ট আছে —এইজন্যে তাঁদের পক্ষেও কর্ম্মের চারিদিকে বড় অবকাশকে প্রসারিত রাখা খুবই আবশ্যক— নইলে ভালো কর্ম্মও নেশা হয়ে উঠে অহংকে উগ্র ও আত্মাকে আবিষ্ট করে দেয়। কর্ম্মের সংসার থেকে তুমি ছুটি পেয়েচ এখন তুমি আদেশের জন্যে বাইরের দিকে তাকিয়ো না। অন্তরতম নিজের কাছে

এসো— তার কাছ থেকে এখন সাড়া পাবে। যে গুরু নিজেকে ভোলান না বলেই অন্যকে ভোলান না সে রকম গুরু নিতান্তই দুর্লভ, অথচ যদি তাঁদের দর্শন মেলে তাঁদের মত সুলভ কেউ না। যার দরকার আছে তাকে না দিয়ে তাঁরা থাকতেই পারেন না, নইলে তাঁরা অকৃতার্থ হন,— ভরা মেঘ মরুভূমিতেও জলবর্ষণ না করে থাক্‌তে পারে না। সেইরকম গুরুই কতবার পৃথিবীতে এসেচেন, আর তাঁদের যা দেবার তা দিয়ে চলে গেছেন— না দিয়ে যাবার জো ছিল না। ভেবে দেখ, ভারতে এমন দিন ছিল যখন লিপি ছিলনা, গ্রন্থ আকারে ভাবপ্রকাশ করবার উপায় ছিল না— তবু যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা না দিয়ে যেতে পারেননি। আমি ত তাঁদেরই এক একটি বাণীর মধ্যে গুরুর স্পর্শ পাই। আর কিছুনা, সেই বাণী শান্ত হয়ে শুন্‌তে হয়— নিজের আত্মার বাণীর সঙ্গে তার সুর মিল করে তবে তাকে পাওয়া যায়। মন যখন শান্ত তখন একটিমাত্র শব্দই যথেষ্ট, "সত্যং"— বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে,— শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং— কোথাও কিছু আর ফাঁক থাকেনা— কেননা কোলাহল-মুক্ত হলে এই ধ্বনি আপনার মধ্যেই শোনা যায়। আনন্দরূপমমৃতং —অনন্ত দেশকাল আনন্দের অমৃতে নিবিড়, নিজের নিভৃত আত্মার মধ্যেই তার চরম সাক্ষ্য। সে সাক্ষ্য না পেলে বাইরের কথার কোনো মূল্য নেই। আমরা যখন গুরুকে মানি তখন গুরুকেই মানি সত্যকে না,— সত্যকে তখনি যথার্থ মানি যখন

আত্মার কাছে তাকে পাই।

তোমাকে লেখা আমার যে চিঠিগুলি প্রবাসীতে বেরিয়েচে তা পড়ে অনেকে আনন্দ পেয়েচেন। এই সম্বন্ধে আমি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ খুব সুন্দর পত্র পেয়েচি— সেটা আমার পক্ষে বড় সান্ত্বনার। নিজের ভিতরকার ঠিক কথাটি লেখা একেবারেই সহজ নয়,— তুমি আমাকে লিখিয়েচ বলেই লিখেচি— কোমর বেঁধে সাধারণকে উপদেশ দেবার জন্যে যদি লিখ্‌তুম তা হলে বানানো কথা হত— অন্তরের সহজ কথা বল্‌তে পারতুম না।

বাকি চিঠিগুলি শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় আমাকেই যদি পাঠাও আমি বাছাই ও কপি করিয়ে প্রবাসীতে পাঠিয়ে দেব। ইতি ২০ মাঘ ১৩৩৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৩

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিগুলি পেয়ে তার থেকে কিছু কিছু কপি করিয়ে নিয়েছি। প্রবাসীতে পাঠাব।

ইতিপূর্ব্বে দুই সংখ্যা প্রবাসীতে তোমার চিঠিগুলি বেরিয়েচে। তার মধ্যে এক সংখ্যা বোধ হচ্চে তুমি পাও নি।

দেবার মতো জিনিষ আমরা কিছুই দিতে পারি নে যদি নেবার শক্তি জাগ্রত না থাকে। মেঘ বারবার আকাশে আসে তার পরে ভেসে চলে যায়, যেবার পৃথিবীর গ্রহণশক্তি অনুকূল হয় মেঘের বৃষ্টিশক্তি সেইবারই সার্থক হয়। চিঠি তোমাকে অনেকগুলি লিখেচি সে তুমিই আমাকে লিখিয়েচ। এতে আমারই নিজের উপকার। কেননা নিজের সব কথা সব সময়ে নিজে শুন্‌তে পাইনে, শ্রোতা যখন শোনে তখনি নিজে শুন্‌তে পাই। যারা বলিয়ে নিতে পারে এমন শ্রোতা সংসারে খুবই কম। এ কথা নিশ্চয় জেনো পৃথিবীতে অনেক বাণীই অকথিত রয়ে গেছে— বক্তার অভাবে নয়, শ্রোতার অভাবে। যিনি বল্‌তে পারতেন তাঁকে বলানো হল না বলে তিনি বঞ্চিত হয়েচেন।

কিছুদিন পরে আবার আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আছে। য়ুরোপে যাওয়া নিয়ে অনেকবার তুমি আমাকে প্রশ্ন করেচ। এটা মনে রেখো সেখানে আমি যা বল্‌তে পারি

এখানে তা পারি নে— সেখানে নিজের বাণীসম্পদ নিজে আবিষ্কার করি— যারা শোনে তারাই সাহায্য করে। ইতি ৬ ফাল্গুন ১৩৩৪

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালকের রেজেস্ট্রিডাকে তোমার
চিঠি ফেরৎ পাঠাবো।

৯৪

১৬ অক্টোবর ১৯২৯

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

চিত্ত যখন উদ্‌ভ্রান্ত হয় তখন মানুষ বাইরে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায় কিন্তু মানুষের উপর আদেশ আছে তাকে আপনার আশ্রয় আপনি সৃষ্টি করে নিতে হবে। নিজের অন্তরের মধ্যে যতক্ষণ না ফিরিয়ে আনতে পারি ততক্ষণ সংসারের দীর্ঘ ও জটিল পথের আর অন্ত পাইনে। সব ভ্রমণ ও সব সন্ধানের শেষ নিজের মধ্যেই এইটে বুঝতে আমাদের অনেক সময় লাগে। নিজের মধ্যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকেই বলে পরিত্রাণ, বাইরে তাকে হাৎড়ে বেড়াই কোথায়? কিন্তু এ সব কথা কথা মাত্র— বলে বিশেষ ফল নেই— অন্তরের মধ্যে সত্যে ধ্রুব হওয়া বল্‌তে কী বোঝায় সেইটে ঠিক মতো বুঝতে পারলেই রক্ষা পাই। মানুষের জন্মকাল থেকে হাজার পথে বাইরের দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াই তার মনের অভ্যাস— কোন্ শক্তির দ্বারা সেই অভ্যাসকে দমন করা যেতে পারে এইটেই দুরূহ প্রশ্ন। এ সব বিষয়ে যেটা লক্ষ্য সেটাই উপায়। আর্থিক ব্যবসায়ে টাকা দিয়ে টাকা পেতে হয়— এও সেই রকম— নিজের মধ্যে পাথেয়রূপে যদি আনন্দ থাকে তবে সেইটেই গম্যস্থানের আনন্দনিকেতনে নিয়ে যায়। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ৩০ আশ্বিন ১৩৩৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

১০ মে ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনেক দিন পরে তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। সংসার থেকে সরে এসে নিভৃতে আশ্রয় নিয়েছ এই মুক্তির মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে নিজের অন্তর থেকে নিজের শান্তিকে উদ্ভাবন করতে পারবে। কর্ম্মজাল কাটিয়ে বেরিয়ে পড়বার পথ আমার নেই, যদিও ছুটি চাই। আমার শরীর মোটের উপর ভালোই আছে কিন্তু কাজকর্ম্ম করবার যোগ্যতা অনেক কমে গেছে। আমার বয়সে শক্তির এই খর্ব্বতা ভালোই— বাহিরের দাবী তাতে কমে যায়। কিন্তু এককালে যে ধনী ছিল সে নির্ধন হলেও চাল কমানো সহজ হয় না, ফলে এই হয় লোকের প্রত্যাশা সমানই থাকে অথচ তহবিলে টানাটানি।

তোমার প্রতি আমার আশীর্ব্বাদ রইল। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত

১
৬ মে ১৯০৮

ওঁ জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ ইহা নিশ্চয় মনে রাখিবে, নিজের, বা পরিবারের বা দেশের কাজে ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন না। যদি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও পাপকে আশ্রয় করি তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। বিধাতার এই নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৃথা। দেশের যে দুর্গতি-দুঃখ আমরা আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহার গভীর কারণ আমাদের জাতির অভ্যন্তরে নিহিত হইয়া রহিয়াছে— গুপ্ত চক্রান্তের দ্বারা নরনারী হত্যা করিয়া আমরা সে কারণ দূর করিতে পারিব না আমাদের পাপের বোঝা কেবল বাড়িয়াই চলিবে।

এই ব্যাপারে যে সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও বিচলিতবুদ্ধি যুবক দণ্ডনীয় হইয়াছে তাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারেনা— কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই দণ্ড আমাদের সকলের দণ্ড— ঈশ্বর আমাদিগকে এই বেদনা দিলেন— কারণ, বেদনা ব্যতীত পাপ দূর হইতেই পারেনা— সহিষ্ণুতার সহিত এ সমস্তই আমাদিগকে বহন করিতে হইবে— এবং ধর্ম্মের প্রশস্ততর পথকেই অবলম্বন করিতে হইবে। পাপের পথে পথ-সংক্ষেপ হয় বলিয়া আমরা ভ্রম করি সেইজন্যই অধৈর্য্য হইয়া আমরা সেইদিকে ধাবিত হই কিন্তু তাড়াতাড়ি করিতে গিয়াই সফলতাকে বিসর্জ্জন

দিই। আজ আমাদের পথ পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গেল—এখন আবার আমাদিগকে অনেক দুঃখ অনেক বাধা অনেক বিলম্বের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে মাথা নত করিয়া পুনর্ব্বার আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে—যত কষ্ট হউক্, যত দূরপথ হউক্ অবিচলিত চিত্তে যেন ধর্ম্মেরই অনুসরণ করি। সমস্ত দুর্ঘটনা সমস্ত চিত্তক্ষোভের মধ্যে ঈশ্বর যেন আমাদিগকে সেই শুভবুদ্ধি দান করেন। ইতি ২৩শে বৈশাখ ১৩১৫

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, তুমি যে দুরূহ প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিয়াছ পত্রের মধ্যে তাহা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। আমি এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছি তাহাতে আমার মত যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। সম্ভবত ভারতীতে তাহা বাহির হইবে এবং যদি কর্তব্য বোধ করি তবে কোনো সভাতেও তাহা পাঠ করিতে পারি। উদার দৃষ্টিদ্বারা জাত্যাচারকে

হইতে করিয়া দেখিতে থাক —
সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি ও দুর্গতির
দুঃখতাপের মধ্যেও ঈশ্বরের
মঙ্গল ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাসকে স্থির
করিয়া তোমার কল্যাণপূর্ণ ব্যথিত
চিত্ত সান্ত্বনালাভ করুক এই
আমি আশীর্ব্বাদ করি। ইতি
২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

১৫ মে ১৯০৮

ওঁ জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, তুমি যে দুরূহ প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিয়াছ পত্রের মধ্যে তাহা বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমি এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছি তাহাতে আমার মত যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। সম্ভবত ভারতীতে তাহা বাহির হইবে এবং যদি কর্ত্তব্য বোধ করি তবে কোনো সভাতেও তাহা পাঠ করিতে পারি। উদার দৃষ্টি দ্বারা জগদ্ব্যাপারকে বৃহৎ করিয়া দেখিতে থাক— সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি ও দুর্ব্বিষহ দুঃখতাপের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাসকে স্থির করিয়া তোমার করুণাপূর্ণ ব্যথিত চিত্ত সান্ত্বনা লাভ করুক এই আমি আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

৩০ মে ১৯০৮

ওঁ কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ সর্ব্বদাই ঈশ্বরের দিকে মনকে ফিরিয়ে রাখা, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা, এবং সমস্ত কর্ত্তব্যকে তাঁর কাজ মনে করে ধৈর্য্যের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন করে যাওয়া এ ছাড়া সংসারে শান্তির আর কি উপায় আছে আমি ত জানি নে। কোনো কোনো লোক, ঈশ্বরকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এক একটি মন্ত্রকে আশ্রয় করে থাকেন— রামমোহন রায় সমস্ত চিত্তক্ষোভ থেকে নিজেকে উত্তীর্ণ করবার জন্য গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বন করেছিলেন— যখনি তাঁর মন কোনো কারণে চঞ্চল হত তখনি তিনি ঐ মন্ত্র মনে মনে স্মরণ করতেন এবং ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত বন্ধন এড়িয়ে মুক্তিক্ষেত্রে গিয়ে উপনীত হতেন। আমিও উপনিষদের কোনো কোনো শ্লোককে এইরূপ আশ্রয়ের মত অবলম্বন করে থাকি। এই রকম একএকটি মন্ত্র তুফানের সময় হালের মত কাজ করে।

আমার প্রবন্ধ সভাস্থলে পড়া হয়ে গেছে। পুস্তিকা আকারে ছাপা হচ্চে— তোমাকে দুই একদিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেব। এই কথা মনে রেখো, নিজের জন্যেই কি, আর দেশের জন্যেই কি, যা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য তাই একমাত্র সত্য। কোনো উপস্থিত ক্রোধে লোভে বা কোনো ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির উত্তেজনায় ধর্ম্মকে খর্ব্ব

করতে গেলে কখনো মঙ্গল হতে পারে না। নিজের প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি অনুসারে ধর্ম্মের উপরে হস্তক্ষেপ না করে মরুভূমির পথে ধ্রুবতারার মত একাগ্রলক্ষ্যে তার দিকে দৃষ্টি রাখ্‌লে দুঃখ পাই আর যাই পাই পথ হারিয়ে বিনাশের মধ্যে পড়তে হবেনা। ইতি ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

৯ জুন ১৯০৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার উপর রাগ করিব এমন কোন কারণ ত ঘটে নাই। ঈশ্বর তোমার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া রাখুন এই আমি কামনা করি— তাহা হইলে কোনো সাময়িক ক্ষোভে তোমার অন্তঃকরণ সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারিবেনা।

তোমাকে "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিয়াছি। "সমস্যা" নামক আর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি ছাপা হইলে তাহাও পাঠাইয়া দিব। ইতি ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

২৫ জুলাই ১৯০৮ ওঁ শিলাইদা

নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ আমি কিছুদিন শিলাইদহে পদ্মানদীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। এ জায়গাটি সুন্দর নির্জ্জন এবং স্বাস্থ্যকর— সেইজন্য সুযোগ পাইলেই আমি এইখানে আসিয়া জলে বাস করি।

ঈশ্বর যখন দুঃখ দেন তখন সে দুঃখকে মঙ্গল বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে সহজ নহে। তথাপি সেই সাধনাই আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, সুখ ও স্বার্থের সম্বন্ধ নহে। যদি তাঁহাকে ভক্তি করি তবে দুঃখ আমাদের দুঃখই দিতে পারে না— মন যখন মোহে অভিভূত থাকে, সংসারের সকল জিনিষকেই যখন অত্যন্ত অসঙ্গতরূপে বড় বলিয়া মনে হয় তখনই কথায় কথায় আমরা অকারণে দুঃখে জড়িত হইয়া পড়ি। সকলের চেয়ে তিনিই সত্য, তিনিই বড়, তিনিই চরম— আমাদের এই অতি ক্ষুদ্র জীবনের ঘটনাগুলি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া ওঠা আমাদের মূঢ়তা। ঈশ্বর তোমাকে শান্তি দিন, শক্তি দিন, তাঁহার প্রতিই তোমার অন্তরের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট এবং তোমার জীবনের নির্ভরকে জাগ্রত করুন। ইতি ১০ই শ্রাবণ ১৩১৫

আশীর্ব্বাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

১৩ অগস্ট ১৯০৮

ওঁ জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ কাজে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম এবং নানাস্থানে ঘুরিতে হইতেছিল সেইজন্য পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব ঘটিল। আগামী কল্য বোলপুরে গমন করিব।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন এবং তোমার চিত্তকে মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত করুন। ইতি ২৯শে শ্রাবণ ১৩১৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

১৫ নভেম্বর ১৯০৮

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, আমি কিছুকাল পদ্মায় বোটে ছিলাম— শরীর ভাল ছিলনা। এখনো বিশেষ ভাল নাই। নানা কর্ম্মজালেও জড়িত আছি এই জন্যই পত্র লিখিতে পারি নাই। বোধ করি শরীরের একটা চিরন্তন ক্লান্তিবশতই পত্র লিখিতে জড়তা উপস্থিত হয়।

এখন আমার বয়স হইয়া গেছে— অনেক ঘটনা, অনেক চিন্তা, অনেক সুখদুঃখের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি। তোমাদের এখন অল্প বয়স— তোমাদের সমস্ত মন এখন যে ক্ষেত্রে আছে সেখান হইতে আমাদের চিন্তার বিষয়গুলি বেশ সুস্পষ্ট ও সত্য-রূপে তোমাদের গোচর হয় না— এই জন্যই আমার কথা তুমি ঠিক বুঝিতেছ না। কথা ত কেবল কথার মানে দিয়া বোঝা যায় না— সমস্ত প্রকৃতি দিয়া জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়া বুঝিতে হয়। এই জন্যই, আমার লেখা পড়িয়া তোমার কাছে তাহার অর্থ যদি অস্পষ্ট ঠেকে তবে মনে কোনো ক্ষোভ করিয়ো না। পথ অসংখ্য আছে — তোমার কাছে যে পথ সহজ সেই পথ দিয়াই একদিন তুমি সত্যে গিয়া উপনীত হইবে— আমার পথেরই যে অনুসরণ করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। কেবল এই কথা মনে রাখিয়ো— ঈশ্বরই সত্য স্বরূপ— সেই পূর্ণ সত্যের অভিমুখেই চলিতে হইবে— অনেক ক্ষুদ্র জিনিষ আমাদিগকে পথের মধ্যে

ভুলাইতে আসে— তাহারা বড় বড় নাম ধরিয়া আসিলেও তাহা-দিগকে সেই সর্ব্বোত্তম সত্যের সিংহাসনে বসাইতে যাইয়ো না— যাহা ভূমা, তাহার পরিবর্ত্তে আর কোনো বিড়ম্বনাকেই বড় এবং শ্রেয় মনে করিয়ো না। ধর্ম্ম নিজের স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থের চেয়েও বড়— য়ুরোপ এই কথা ভোলে বলিয়া যে তাহাদের নকল করিয়া আমাদিগকেও ভুলিতে হইবে এমন দুর্ভাগ্য যেন আমাদের না হয়। ইতি ৩০শে কার্ত্তিক ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

১৯ জানুয়ারি ১৯০৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, আমি প্রায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকি বলে তোমাদের চিঠির উত্তর দিতে পারি না— আমার সময় নিতান্তই কম।

আমি জানিনে আমি তোমাকে এমন কি উপদেশ লিখে পাঠাতে পারি যা গ্রহণ করে তোমার মন আশ্রয় লাভ করতে পারে। বাইরে থেকে বেশি কিছু দেওয়া যায় না— ভিতরের জিনিষকে ভিতরেই লাভ করতে হয়। তোমার মধ্যে যে অন্তর্যামী রয়েছেন তিনি ত কেবল তোমার পৃথিবীর সামগ্রী নন, তিনি তোমার চিরজীবনের সঙ্গী। তিনিই তোমাকে লোকে লোকান্তরে নব নব জীবনের পথে নিয়ে যাবেন। সমস্ত সুখ দুঃখের উর্দ্ধে তাঁকে অনুভব কর— তাঁর পায়ে সমস্ত চিত্তকে অবনত করে সমর্পণ কর— দুঃখকে তাঁর দান বলে গ্রহণ কর— সেই চিরবন্ধুর দিকে চাও। এ ছাড়া আমি তোমাকে আর কি বল্‌তে পারি! হৃদয় যখন চঞ্চল সংসারে যখন তরঙ্গ তখনো মনে রেখো সেই কাণ্ডারী হাল ধরে রয়েছেন— সমস্ত তুফানের উপর দিয়ে তিনি বন্দরে নিয়ে চলেছেন।

তোমার জীবনের সমস্ত দুঃখ চাঞ্চল্য তাঁর দিকেই তোমাকে প্রবলভাবে নিয়ে গিয়ে একান্তভাবে তাঁর প্রতিই তোমাকে সমর্পণ

করে তোমাকে ধন্য করুক এই আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি ৬ই মাঘ ১৩১৫

আশীর্ব্বাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

১৬ এপ্রিল ১৯০৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ ঈশ্বর তোমার চিত্তকে শান্ত করিয়া মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত করুন। তোমার হৃদয় তাঁহার প্রতি ভক্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠুক্। পৃথিবীতে সুখের সঙ্গে কেন দুঃখ জড়িত হইয়া থাকে সে তত্ত্ব তুমি বুঝিবে না— সে সংশয় হইতে মনকে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত করিয়া ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া থাক— নত শিরে তাঁহার সমস্ত বিধান বিনা বিদ্রোহে গ্রহণ কর। মনকে অবসাদে দুর্ব্বল করিয়ো না— উৎসাহপূর্ণ শক্তির সঙ্গে সংসারের সমস্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও— তোমার মানবজন্ম কল্যাণের দ্বারা সার্থক হউক্! ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩১৬

শুভকামী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

১ অক্টোবর ১৯০৯

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। কয় দিন ধরিয়া অনেকগুলি সভায় অনেক বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। আজ ছুটি পাইয়াছি কাল বোলপুরে যাইব।

মা তুমি মনকে খুব নম্র করিয়া প্রতিদিন তাঁর শরণাপন্ন হও। নিজেকে না ভুলিতে পারিলে যথার্থভাবে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। প্রতিদিনই তাঁহার আত্মনিবেদন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অহঙ্কারের বন্ধন নিশ্চয়ই শিথিল হইয়া আসিতে থাকিবে। হৃদয় যখন নিরহঙ্কার হয় তখনই ক্রোধ প্রভৃতি রিপু আশ্রয় না পাইয়া বিদায় লইতে থাকে। নিজেকে সংসারে সকলের চেয়ে নীচে রাখ সুখ পাইবে— সেই তোমার দীনতার আসনে ভগবান তোমাকে সঙ্গ দিবেন। এ সকল উপদেশ মুখে বলা সহজ— কাজে অত্যন্ত শক্ত। আমার মনে অহঙ্কার কতদিকে কত মোটা ও সূক্ষ্ম শিকড় বিস্তার করিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই— সেইজন্যই কথায় কথায় কত অসহিষ্ণু হই— ভিতরে ভিতরে কত রাগ করি কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিন আমি এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি আমাকে এই সকল বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি দিন। প্রার্থনায় ফল লাভ হাতে হাতে হয় না— কিন্তু মনে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে প্রার্থনা কখনই ব্যর্থ হইবেনা। তুমিও হতাশ হইয়োনা—

নিশ্চয় জানিয়ো যদি প্রত্যহ তুমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াও ক্রমে তোমার মন নরম এবং তোমার বন্ধন আলগা হইবেই ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ঈশ্বরকে মন দিতে দিতে ঈশ্বর তোমার অন্তরের সামগ্রী হইয়া উঠিবেন ইহা নিশ্চয় জানিবে। ইতি ১৫ই আশ্বিন ১৩১৬

শুভকামী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

৪ ডিসেম্বর ১৯০৯

ওঁ বোলপুর

পরমকল্যাণীয়াসু

মা, তোমার চিঠি যখন পাইয়াছিলাম বড় ব্যস্ত ছিলাম তাই জবাব দিতে পারি নাই। আমার শরীর মোটের উপর ভালই আছে। প্রতিদিন তুমি ঈশ্বরের কাছে আপনাকে সমর্পণ কর তিনি ধীরে ধীরে তোমার চিত্তকে শান্তি ও কল্যাণে বিকশিত করিয়া তুলিবেন। মনকে নিজের দিকে বা সংসারের দিকে না রাখিয়া যদি তাঁহার দিকে রাখিবার সাধনা কর তবে হৃদয়ের গ্রন্থি মোচন ও জীবনের সমস্ত জটিলতা দিনে দিনে দূর হইয়া যাইবে। ইতি ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২
২৫ এপ্রিল ১৯১০

ওঁ বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, তুমি আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। জীবনে সকল অবস্থাতেই এবং সংসারের সকল সম্বন্ধের মধ্যেই তোমার চিত্ত নম্রভাবে এবং আনন্দে তাঁহার বিধানকে স্বীকার করিয়া লইবার বল লাভ করুক্। তোমার সরল হৃদয়টি সত্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক্ এবং বাহিরে যে কোনো অভাব থাক্ তোমার অন্তরের পূর্ণতাদ্বারা সমস্তকেই তুমি মঙ্গলে ও মাধুর্য্যে আনন্দময় করিয়া তোলো।

আমাদের এখানে নববর্ষের দিনে উৎসব হইয়াছিল। তাহার পর হইতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। আজ বিদ্যালয়ের ছুটি হইয়াছে আজ হইতে কিছুদিনের জন্য অবকাশ পাইব। বোধহয় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কোথাও যাইব। কবে এবং কোথায় যাওয়া হইবে এখনো স্থির করিতে পারি নাই।

মা, তোমার যখন ইচ্ছা হয় আমাকে চিঠি লিখিয়ো। এক এক সময় আমি ব্যস্ত থাকি, তা ছাড়া আজ কাল ক্লান্তি ও আলস্যে সব সময় পত্রাদি লিখিতে পারি না— যদি কখনো উত্তর না পাও বা বিলম্ব ঘটে কিছু মনে করিয়ো না। তুমি নিশ্চয় জানিয়ো তোমার মঙ্গল হয় এই আমার অন্তরের কামনা। সংসারের কল্যাণরূপিণী হইয়া থাক— তোমার চরিত্রের দীপ্তিতে

চতুর্দ্দিককে জ্যোতির্ম্ময় এবং হৃদয়ের মাধুর্য্যে সকলকে আনন্দিত করিয়া গৃহের মধ্যে পুণ্যপ্রতিমা হইয়া বিরাজ কর এই আমি মনের সঙ্গে প্রার্থনা করি।

আমাকে যদি চিঠি লেখার প্রয়োজন বোধ কর তবে ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, জোড়াসাঁকো, কলিকাতার ঠিকানায় লিখিয়ো। তোমার ঠিকানা পত্রের মধ্যে দাও নাই— বোধ করি ১২১ নম্বর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটেই আছ— সেই ঠিকানাতেই পত্র পাঠাইতেছি। ইতি ১২ই বৈশাখ ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

৮ মে ১৯১০

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

পরম কল্যাণীয়াসু

মা, আজ আমার জন্মদিন। তাই এখানে আমাদের আশ্রমের বালকেরা আমাকে নিয়ে উৎসব করচে। আজ তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম।

তাঁকে প্রতিদিন বারম্বার ডাক্‌তে ডাকতেই মনের সমস্ত বাধা কাট্‌তে থাকে। তাঁর নাম ক্রমে ক্রমে আমাদের সমস্ত শরীর মনের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনকে পবিত্র করে তোলে। তুমি তাঁর নামের ধারা দিয়ে মনের সমস্ত ধুলো ধুয়ে ফেল। আপনাকে ভুলে গিয়ে তাঁকেই সব চেয়ে বড় করে সত্য করে জান্‌তে হবে। কিন্তু সংসারে আমরা দিনরাত্রি কেবল আপনাকেই দেখি বলে সেই আমাদের অহংই প্রবল হয়ে ওঠে। এই জন্যই বারবার তাঁকে ডাক্‌তে ডাক্‌তে তাঁকেই সত্য বলে জানবার অবকাশ ও অভ্যাস হয়— তা হলেই ধীরে ধীরে প্রবৃত্তির বাধা কেটে যেতে থাকে।

নিরাশ হোয়ো না— যতই বিলম্ব হোক্ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন তাঁর নাম নেবার সাধনা কর তোমার জীবন আপনি ভিতরে ভিতরে কখন্ যে সার্থক হয়ে উঠ্‌বে তা জান্‌তেও পাবেনা।

ঈশ্বর তোমার মনকে সর্ব্বত্র পূর্ণ করে তোমার জীবনকে সার্থক করুন। ইতি ২৫শে বৈশাখ ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

২ জুলাই ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেয়েছি।

মাঝে আমার শরীর বিশেষ অসুস্থ হয়েছিল। কিন্তু এখন সম্পূর্ণ সেরে উঠেছি। আমার শরীরের জন্যে কিছু মাত্র চিন্তা কোরো না— যতদিন এখানে আমার কাজ আছে ততদিন ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বেন। আমি অনেকদিন থেকেই অল্প আহার করে থাকি তাতে আমার শরীরের কোনো অনিষ্ট হয় না এবং আমার সমস্ত কাজকর্ম্মও সম্পূর্ণ বলের সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারি।

তোমার সংসারের প্রতিদিনের কর্ম্মই তোমার ভগবানের উপাসনা হোক্। তোমার জীবন সুন্দর হোক্ তোমার চিত্ত নির্ম্মল হোক্— সকলের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ সত্যে ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ হোক্— তাহলেই তোমার সরল হৃদয়টি বিশেষভাবে তাঁকে স্মরণ না করলেও তিনি আপনি এসে তোমার অগোচরেও প্রতিদিন হাত বাড়িয়ে তোমার পূজা গ্রহণ করবেন। ইতি ১৮ই আষাঢ় ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

৬ অগস্ট ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, সংসারের নানা গোলমালের মাঝখানে মনকে শান্ত ও সুন্দর রাখা অত্যন্ত শক্ত সে কি আমি জানি নে? বিশেষত মেয়েদের সর্ব্বদাই অত্যন্ত ছোটখাট খুঁটিনাটির মধ্যেই দিন কাটাতে হয়— মনকে উদার ভাবের ক্ষেত্রে রাখবার উপায় ও অবকাশ মেয়েদের নেই। কিন্তু কি করবে মা? যা কঠিন তাই সাধন করতে হবে। এমন কোনো একটি মন্ত্রকে মনের মধ্যে অভ্যাস করে নেবে যেটি স্মরণ হবামাত্র মন একমুহূর্ত্তে সেই সবচেয়ে বড় জায়গায় গিয়ে ঠেক্‌বে। মনকে ঈশ্বরের মধ্যে স্থির করবার জন্যে রোজ খানিকটা করে সময় দিতে হয়— তাঁকে মনের মধ্যে অত্যন্ত কাছে করে একবার অনুভব করে নিতে হয়— তার পরে সমস্ত দিন সংসারের কাজকে তাঁর কাজ বলে জেনে তার সকল ঝঞ্ঝাট মাথায় করে নেবার জন্যে নম্রভাবে প্রস্তুত হতে হয়। যখনি মন উত্ত্যক্ত হয়ে উঠবে, অসহিষ্ণু হয়ে উঠ্‌বে, আঘাত করতে ও আঘাত পেতে উদ্যত হবে তখনি মনকে টেনে ধরে এই কথাটি তাকে শোনাতে হবে যে, তোমার এ সমস্তই মিথ্যা, মায়া, তুমি আনন্দময়ের উপলব্ধি থেকে দূরে পড়চ বলেই এই রকম শুকিয়ে তপ্ত হয়ে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌চ। শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্— যিনি সমস্ত জগৎ জুড়ে অন্তরে বাহিরে চিরদিন আছেন, তাঁকেই

চরম সত্য বলে জানলে সংসারের সমস্ত ক্ষোভের কারণগুলো মুহূর্ত্তের মধ্যে অত্যন্ত ছোট হয়ে যায়।

যাই হোক্ প্রতিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করে মনকে শান্তিতে ও মাধুর্য্যে অচলপ্রতিষ্ঠ করে তোলো— এ ছাড়া তোমাকে আর কি বল্‌তে পারি। সমস্তই নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে— সেই শক্তি তোমার নেই এ কথা কল্পনাও কোরো না— আছে শক্তি, তাকে অবিশ্বাস করে দুর্ব্বল হয়ে থেকোনা। ঈশ্বর তোমার হৃদয়কে প্রেমে ও জীবনকে মঙ্গলে পূর্ণ করে তুলুন। ইতি ২১শে শ্রাবণ ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- ১৬

২০ জানুয়ারি ১৯১১

ওঁ   জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার চিঠি আজ পেয়েছি। শরীর আমার ভালই আছে। কিছু দিন পদ্মাতীরে বাস করে এসেছি। মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে কয়েক দিন হল কলকাতায় ফিরে এসেছি।

তাঁর প্রেম তোমার চিত্তে অবতীর্ণ হয়ে তোমার অভাব অপূর্ণতা একেবারে ঘুচিয়ে দিক্ এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। সেই আনন্দময়ের এই সংসারকে সর্ব্বত্র তুমি আনন্দময় করে দেখতে থাক। এখানকার সুখে দুঃখে মানে অপমানে তাঁরই প্রকাশ এই কথা নিশ্চয় জেনে সমস্তই আনন্দের সঙ্গে বহন কর— প্রতিদিন যা কিছু পাবে সমস্তই শক্তির সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ কর। মনে মনে যখন-তখন বারম্বার তাঁর নাম নিতে থাক— তিনিই যে চিরন্তন সত্য এই কথাটা স্মরণ করে রাখবার এই একমাত্র উপায়। জীবনকে ছোট হতে দিয়োনা— আপনাকে সেই অনন্ত সত্যের মধ্যে বড় করে জান— জীবনে মরণে তোমার হৃদয়টি তাঁর মধ্যেই বিকশিত হয়ে উঠ্‌চে এই কথাটি অন্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে পূজার ফুলের মত নির্ম্মল পবিত্র হয়ে, পুণ্যের সৌন্দর্য্যে সৌগন্ধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠ— পাপের কালিমা অন্তরে বাহিরে কোথাও তোমাকে স্পর্শ না করুক। আপনাকে তাঁর কাছে নিবেদন করে দাও— তাহলে সংসারকে নূতন করে সুন্দর

করে পাবে— তোমার মানবজন্ম সার্থক হয়ে উঠ্‌বে। ইতি ৬ই মাঘ ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

৪ জুলাই ১৯১১

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, আমার পক্ষে চিঠি লেখা বড় কঠিন। সময় পাই না—শরীরও অপটু। চিঠি লিখি বা না লিখি তুমি মনকে উদ্বিগ্ন করিয়োনা। আমার এখন সকল কাজ হইতে ছুটি লইবার সময়—এইজন্য যতদূর সম্ভব কর্ম্মভার বাড়িতে দিই না।

মা তোমার অল্প বয়স— সম্মুখে দীর্ঘ সংসারের পথ— সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া আনন্দের সহিত অকুণ্ঠিত শক্তির সহিত যাত্রা করিয়া চল একদিন শান্তি পাইবে সার্থকতা পাইবে। বারম্বার কেন তুমি নিজের সম্বন্ধে হতাশ হইয়া ধিক্কার দিতেছ? আমরা কে, যে, তোমাকে দূরে বসিয়া পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিব! তোমার নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।

আমার শরীর ক্লান্ত আছে বলিয়া তোমাকে আর লিখিতে পারিলাম না। ইতি ১৯শে আষাঢ় ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

১১ অগস্ট ১৯১১

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, পূর্ব্বের চেয়ে এখন আমি অনেকটা ভাল আছি।

তোমার মাতার "প্রবাহ" বইখানি আমি গিরিডি থাকিতে দেখিয়াছিলাম। কবিতাগুলির মধ্যে একটি স্নিগ্ধতা আছে— তোমার মার যে স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের কবিত্বশক্তি থাকিলেও তাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে না। তাঁহারা অন্তঃপুরে যে পারিবারিক গণ্ডিটুকুর মধ্যে বদ্ধ থাকেন সেখানে জীবনের অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ এবং সেখানে কল্পনাবৃত্তি প্রসরতা লাভ করিতে পারেনা। তাহা ছাড়া নানা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যরচনার সহিত পরিচয়ের দ্বারা চিত্তবৃত্তির যে স্ফূর্ত্তি ঘটে আমাদের মেয়েদের সে সুযোগও অতি অল্প। এই জন্য আমাদের লেখিকাদের কবিতা সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে দুর্ব্বলভাবে বিচরণ করে— তাহার মধ্যে সরলতা ও কোমলতা থাকে কিন্তু যথেষ্ট শক্তি থাকেনা। এই জন্য সাহিত্যে এইরূপ কবিতা কোনোমতেই নিত্যস্থান লাভ করে না। তাহা জুঁইফুলের মত এক সন্ধ্যার মধ্যেই ফুটিয়া ঝরিয়া পড়ে। কবির কবিত্বশক্তির অভাবে এরূপ ঘটে তাহা নহে— জগতের সঙ্গে মানবজীবনের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ অতি সামান্য বলিয়াই তাঁহাদের কবিত্ব কিছুদূর পর্য্যন্ত অঙ্কুরিত হইয়া আর বেশি

বাড়িতে পায় না।

আমি আগামী কাল শনিবারে কলিকাতায় যাইব। তুমি যে ছেলেটির কথা লিখিয়াছ তাহাকে আমার কাছে একবার পাঠাইয়া দিয়ো। আমাদের বিদ্যালয়ে অনেকগুলি ফ্রি ছাত্র আছে— আর ত স্থান নাই। বিশেষত বিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থার ভার আমার হাতে নাই— কারণ আমি সে সম্বন্ধে নিতান্তই অপটু। আমার হাতেই যখন সে ভার ছিল তখন বিদ্যালয় দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এইজন্য বিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থায় আমি কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করি না। তবু যদি কিছু করিতে পারি আমি চেষ্টা করিব। ছেলেটির বয়স কত এবং তাহার স্বভাব কিরূপ তাহা জানা আবশ্যক। আমাদের এখানে অনেক ছোট ছোট ছেলে আছে এই জন্য আমাদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি। নূতন ছেলে লইবার সময় আমাদের বিশেষ সাবধান হইতে হয়।

ঈশ্বরের প্রেমে হৃদয়কে সরস করিয়া প্রফুল্লমুখে প্রসন্নমনে তুমি সংসারের সেবায় নিযুক্ত থাক এই আমি প্রার্থনা করি। ইতি
২৬শে শ্রাবণ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

৯ অক্টোবর ১৯১১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, আমি দূরদেশে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্চি। আমার সেখানে অন্য কোনো প্রয়োজন নেই— কেবল কিছু দিন থেকে আমার মন এই কথা বল্‌চে যে, যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব। এর পরে আর ত সময় হবেনা। সমস্ত পৃথিবীর নদীগিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্চে— আমার চারদিকের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মন উৎসুক হয়ে পড়েছে। আমরা যেখানে দীর্ঘকাল থেকে কাজ করি সেখানে আমাদের কর্ম্ম ও সংস্কারের আবর্জ্জনা দিনে দিনে জমে উঠে চারদিকে একটা বেড়া তৈরি করে তোলে। আমরা চির জীবন আমাদের নিজের সেই বেড়ার মধ্যেই থাকি, জগতের মধ্যে থাকিনে। অন্ততঃ মাঝে মাঝে সেই বেড়া ভেঙে বৃহৎ জগৎটাকে দেখে এলে বুঝতে পারি আমাদের জন্মভূমিটি কত বড়— বুঝতে পারি জেলখানাতেই আমাদের জন্ম নয়। তাই আমার সকলের চেয়ে বড় যাত্রার পূর্ব্বে এই একটি ছোট যাত্রা দিয়ে তার ভূমিকা করতে চাচ্চি— এখন থেকে একটি একটি করে বেড়ি ভাঙতে হবে তারই আয়োজন।

তুমি জীবনকে কল্যাণময় ও সংসারকে পবিত্র ও মধুর করে

তোলো— তুমি চারিদিকে প্রসন্নতা বিকীর্ণ করে সুখদুঃখের উপর দিয়ে সহজে ও আনন্দে চলে যাও তোমাকে আমি এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ২২শে আশ্বিন ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

১৬ নভেম্বর ১৯১১

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার উপর রাগ করবার ত কোনো কারণ হয় নি। ইতিমধ্যে আমি বোটে পদ্মার চরে আশ্রয় নিয়েছিলুম। সেখানে নির্জ্জনে যখন থাকি তখন চিঠিপত্র লেখা আমার আর হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে আমার এই রকম সম্পূর্ণ ছুটি নেবার দরকার হয়। যখন আমি কলকাতায় কিম্বা কাজকর্ম্মের মাঝখানে থাকি তখন চিঠিপত্র লিখ্‌তে পারি কিন্তু যখন পূর্ণ অবকাশের মধ্যে বাস করি তখন সে অবকাশ ভাঙতে ইচ্ছা করি নে। আজকাল চিঠি অতি অল্পই লিখি।

আমি এই প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমার মনকে শান্ত স্নিগ্ধ কর্তব্যরত করুন— প্রসন্ন চিত্তে তুমি আপনার জীবনকে গ্রহণ কর, সন্তুষ্ট মনে সংসারের কল্যাণ সাধন কর— তোমার চারিদিকের সঙ্গে সকল বিষয়েই তোমার সুন্দর যোগ হোক্, ইচ্ছা যেন বিদ্রোহী ও বিভ্রান্ত না হয়, নত শিরে নম্র মনে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন কর— পূজার অঞ্জলির মত নিজেকে সুন্দর ও পবিত্র করে তাঁর কাছে উৎসর্গ কর— কেবলি আপনার দিকে তাকিয়ে থেকোনা, আপনার কথা ভেবো না— যেখানে তিনি তোমাকে কাজ দিয়েছেন সেইখানেই তাঁর

আদেশ বহন করে চিরকাল তুমি তাঁর সেবিকা হয়ে থাক।
ইতি ৩০শে কার্ত্তিক ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

২৯ জানুয়ারি ১৯১২

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

মা, আমি ভালই আছি। কিছু দিন একলা বোটে করে নদীতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। কাল রবিবারে টাউনহলে আমার সংবর্দ্ধনা হয়ে গেছে সেই উপলক্ষ্যে কলকাতায় আস্‌তে হয়েছে। মা, তুমি অকারণে মনকে বিচলিত হতে দিয়ো না— নিজেকে একেবারে ভুলে যেতে অভ্যাস কোরো— নিজের দিকেই সর্ব্বদা তাকিয়োনা— তোমার অন্তর্যামীকে নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ জেনে পবিত্র মনে শান্ত চিত্তে নিজের কর্ত্তব্যসাধন করে যেয়ো। আপনার প্রবৃত্তি আপনার ইচ্ছাকেই বড় হয়ে উঠ্‌তে দিয়ো না— আপনার মনের কোনো উদ্দাম কল্পনাকে কোনোমতেই কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিয়ো না— ভালো ভাব, ভালো কর, ভালো হও। ইতি ১৫ই মাঘ ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

মা, আমার বিলাতে যাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী হয়ে এসেছে। একমাস আছে। আগামী ৬ই চৈত্রে জাহাজ ছাড়বে। আমার বোলপুর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি। য়ুরোপে যাবার পূর্ব্বে কিছুদিন নির্জ্জনে একটু শান্তি ভোগ করবার জন্যে এখানে পদ্মার তীরে এসেছি। অনেকদিন থেকে অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে দিন কাট্‌ছিল— এই একটা মাস চুপচাপ করে পড়ে থাকব।

ভারতবর্ষ হতে বিদায়ের পূর্ব্বে তোমাকেও আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে যাচ্চি। তুমি মনের মধ্যে বল লাভ কর— অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে সংসারের মঙ্গলব্রত পালন কর— অম্লান পবিত্রতার দ্বারা গৃহের মধ্যে পুণ্যদীপটি জ্বালিয়ে রাখ— তোমার নির্ম্মল প্রীতির মাধুর্য্যে তোমার চারিদিক মধুময় হয়ে উঠুক। ইতি ৭ই ফাল্গুন ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩

৮ মে ১৯১৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ, তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। কিছু দিন হতে নানা কারণে উদ্বিগ্ন আছি। আমেরিকায় যাবার আয়োজন করেছিলুম কিন্তু বাধা পড়াতে আপাতত যাওয়া হলনা।

তুমি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ২৫ বৈশাখ ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

১৫ অক্টোবর ১৯৩৬

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কলকাতায় কিছুদিন থাকবার সংকল্প ছিল, প্রয়োজনও ছিল। জনতার উৎপীড়নে অসুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতে হোলো— তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারলনা।

মনে আছে তোমাকে পত্র লিখেছিলুম, কি লিখেছিলুম মনে নেই। তখন পত্র লেখা আমার পক্ষে সহজ ছিল— কাউকেই বঞ্চিত করি নি, এখন জীর্ণ দেহের খাঁচার মধ্যে মন হয়েছে কৃপণ, এখন সব লেখাই বন্ধ করার সময় নিকটে আসচে।

আবার কোনো এক সময়ে কোনো না কোনো তাগিদে কলকাতায় যাওয়া ঘটবে— তখন সুযোগ পাও তো দেখা কোরো, খুসি হব। শান্তিনিকেতন দুর্গম নয় দূরবর্ত্তীও নয়, এখানে কখনো আসতে পারো তো এসো। ইতি ২৯ আশ্বিন ১৩৪৩

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংযোজন

কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত

১৯ জুন ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার শরীর পূর্ব্বের চেয়ে অনেকটা ভাল আছে— এখন আর বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হয় না !

ইণ্ডিয়ান প্রেস আমার বাংলা বইয়ের প্রকাশক। কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হৌস তাহাদের একমাত্র এজেণ্ট। আমরা কমিশন সেলে বিক্রয়ের অধিকার পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কোনোমতেই রাজি করিতে পারি নাই। আর কাহাকেও বেচিতে দিলে উহাদের এজেণ্টের যে অল্প ক্ষতি হয় তাহা উহারা স্বীকার করিতে রাজি হয় না।

মীরা ভালই আছে। ইতি ৪ আষাঢ় ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রন্থপরিচয়

কাদম্বিনী দত্ত (১২৮৫ ?-১৩৫০) লোকসমাজে সুপরিচিতা ছিলেন না, বা প্রচলিত অর্থে উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরজিজ্ঞাসা ও "অসামান্য ধীশক্তি" রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল— প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল উভয়ের মধ্যে পত্রযোগে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলিয়াছিল। কাদম্বিনী দেবী মহিমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা, কুষ্টিয়ার অন্তর্গত রূপিয়াট গ্রামের প্রাণগোপাল দত্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের অনতিকাল পরেই স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি দর্শন ও সাহিত্যের আলোচনায় এই শোকের শান্তির সন্ধানে উৎসুক হইয়া রবীন্দ্র-রচনার মধ্যে বিশেষ আশ্রয় লাভ করেন এবং ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের সহিত পত্রব্যবহারেও প্রবৃত্ত হন।

কাদম্বিনী দেবী রবীন্দ্র-রচনা দ্বারা অল্প বয়সেই কতদূর প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চায় তাঁহার সঙ্গিনী ও উৎসাহদাত্রী সরলাবালা সরকার তাহার একটি নিদর্শন দিয়াছেন ; 'রাজর্ষি' পড়িয়া তিনি এরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, মালঞ্চী গ্রামে পিত্রালয়ে দুর্গোৎসবে পশুবলি রহিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি আহার ত্যাগ করেন, তিনদিন পরে, বলি বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বালিকাকে আহারে সম্মত করানো যায়। বনলতা দেবী -সম্পাদিত, 'কেবল মহিলাদিগের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত' 'অন্তঃপুর' মাসিক পত্রে (প্রকাশ ১৩০৪ মাঘ) কাদম্বিনী দেবীর কোনো কোনো রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। সরলা দেবী চৌধুরানী -প্রতিষ্ঠিত ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলে তিনি কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করেন।

কাদম্বিনী দেবীর ভ্রাতা 'মৌচাক'-সম্পাদক **সুধীরচন্দ্র** সরকার রবীন্দ্রনাথের মূল পত্রগুলি রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে অনুগ্রহপূর্বক দান করিয়াছেন।

সরলাবালা সরকারের কন্যা, আনন্দবাজার পত্রিকার স্বর্গত সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারের পত্নী নির্ঝরিণী সরকার রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পত্রব্যবহারের বিবরণ ২২ বৈশাখ ১৩৬৩ সংখ্যা দেশ পত্রে 'কবি-পরিচিতি' প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছেন—নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল।— এই প্রবন্ধে উল্লিখিত পিসিমা, কাদম্বিনী দত্ত।

খুব অল্প বয়সেই আমার কবির লেখার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। হয়তো সব কিছু বুঝবার মতো জ্ঞান তখনও হয় নি কিন্তু তবু তাঁর লেখা যে কী ভালো লাগত! আমার মা আর আমার পিসিমা সর্বদাই কবির লেখা নিয়ে আলোচনা করতেন। এমনভাবে কবির সম্বন্ধে তাঁরা কথাবার্তা বলতেন যেন কবি তাঁদের একজন ঘরের লোক, একজন পরমাত্মীয়। তাঁদের মুখে শুনে শুনে সেই অতি অল্প বয়সেই আমারও কবির প্রতি মনে মনে একটা গভীর আত্মীয়তা-বোধ জন্মেছিল। যদিও তাঁকে তখনও দেখি নি এবং তাঁর সঙ্গে যে কোনোদিন দেখা হবে সে সম্ভাবনাও ছিল না, তবুও মনে হত তিনি যেন নিতান্ত আপনার জন।

ছেলেবেলা থেকেই দেশের উপর একটা অনুরাগও মনের ভিতর ছিল। তাই যে ছেলেরা দেশের জন্য জীবনপণ করেছিল তাদের উপরও ছিল একান্ত আত্মীয়তা-বোধ। তাই মানিকতলার বোমার মামলা ও তাহার ফলাফলে আমার মন একেবারে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। মনের সেই অবস্থায় একজন আশ্রয়দাতা, একজন সান্ত্বনা দেবার পাত্রের জন্য মন যখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তখনই আমি কবিকে পত্র লিখি। বয়স আমার তখন ষোলো-সতেরো বৎসরের বেশি নয়। আমি তাঁকে চিঠি লিখছি এ কথা ভাবতে নিজেই নিজের এই সাহসে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কবিকে আমি চিঠি লিখছি? তিনি এই চিঠি পেয়ে কি

ভাববেন? তিনি কি এই চিঠির, আমার এই পাগলামির জবাব দেবেন? এও কি সম্ভব হবে?

কিন্তু তিনি জবাব দিলেন, চিঠি পেয়েই তিনি জবাব দিলেন। কি মিষ্টি তাঁর সেই জবাব। শুনেছি তিনি নাকি চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'বড়ো সরল এই মেয়েটি।'

তার পর কবিকে আমি আরো চিঠি লিখেছিলাম এবং প্রতিবারই উত্তর পেয়েছিলাম খুবই শীঘ্র শীঘ্র। তাঁর উত্তরে তাঁর হাতের লেখা পত্র, সে যেন দেবতার আশীর্বাদী নির্মাল্যের মতোই আমার অতি যত্নের ধন।

তার পর অসম্ভবও সম্ভব হয়েছিল, কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং কেবল একবার নয় তিনবার আমি তাঁর দেখা পেয়েছিলাম। সেসব স্মৃতি আজিও আমার মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

আমার সেই সঞ্চিত মহামূল্য সম্পদ সেই পত্রগুলি যে কোনোদিন লোকের কাছে বাহির করব সে কল্পনা আমার ছিল না, কিন্তু ঘটনাচক্রে সেগুলি প্রকাশ করতে দিতে হয়েছে। সেগুলি দেশ-পত্রিকার কোনো একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবির হাতের ঠিকানা লেখা খামটিও আমি প্রকাশ করতে দিয়েছিলাম।

কবি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি যে বাংলাদেশে জন্মেছেন বাংলার এ কি কম সৌভাগ্য! কিন্তু সে সৌভাগ্য অনুভব করবার ও সমস্ত জীবনযাপনে গ্রহণ করবার মতো অনুভূতি ও সাধনা আমাদের আছে কি? আজ তাঁর পুণ্য জন্মতিথিতে এই কথাই বার বার মনে হচ্ছে।

তাঁর রচনায় যে কি অমৃতের আস্বাদ ছিল, আমি তা লিখে বুঝাতে পারব না। অতি অল্প বয়সে আমি 'রাজর্ষি' পড়েছি আর তখন আমার

শিশুমনে কি একটা অনুভূতি হত যে, অনবরত চোখের জল পড়ত। তরুণ জয়সিংহের মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের সম্বন্ধে যে মনের ভাবের বর্ণনা আছে, কবির সম্বন্ধে আমার সেইরকম মনোভাব ছিল। যেন আকাশের চাঁদের উপর শিশুর আসক্তি।

তাঁর কাছে যখন প্রথম যাই তখন কি যে মনের অবস্থা হয়েছিল আজ তা বলে বুঝানো অসম্ভব। তাঁকে প্রণাম করেছি, তিনি সস্নেহে আমার সেই প্রণাম গ্রহণ করেছেন, মাথায় তাঁর আশীর্বাদী হাতের ছোঁয়া পাচ্ছি; এ কি স্বপ্ন, না সত্য? বোধহয় এই রকমই মনে হয়েছিল।

আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, নিয়ত কত লোক তাঁর দর্শনার্থী হয়ে তাঁর কাছে যাচ্ছে, তাঁর প্রিয়জন সব সময় তাঁকে ঘিরে রয়েছেন, আমার সঙ্গে তাঁর কতটুকুই বা দেখা হয়েছে, তবু কোনোদিন তিনি আমাকে ভুলে যান নি। যখনি দেখা হয়েছে তাঁর চোখে সেই অতি পরিচিতের সঙ্গে মিলনের সস্নেহ ভাবটি ফুটে উঠেছে। আর মনে হয়েছে আমি যেন তাঁর কাছে বড়ো হয়ে যাই নি; সেই ছোটো মেয়েটিই আছি।

তাঁর বর্ষামঙ্গল প্রভৃতিতে এবং যখন তিনি কোনো সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন অথবা নটীর পূজা প্রভৃতি অভিনয় করিয়েছেন, সব জায়গাতেই তাঁকে দর্শন করবার সৌভাগ্য হয়েছে এবং সেইসব ছবি এখনও মনের মধ্যে আঁকা রয়েছে। আজ তাঁর পুণ্য আবির্ভাব-দিনে সেইসব কথাই মনে পড়ছে।

ছেলেবেলাতেই তাঁর অনেক রচনা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আর সে লেখায় যে কি রস পেতাম তা তাঁরই এক ছত্র দিয়ে বলতে পারি, 'না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে কেমনে কিছু না জানি।'

নির্ঝরিণী দেবী রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের মূল-পত্রগুলি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে অনুগ্রহপূর্বক দান করিয়াছেন।

কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত অধিকাংশ পত্র বিভিন্ন সময়ে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, নীচে তাহার সূচী প্রকাশিত হইল—

সাময়িক পত্র	পত্র-সংখ্যা
বিশ্বভারতী পত্রিকা	
বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৪	১-৪
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৪	১১, ১৯, ২৪, ৩৫, ৩৮, ৪৪ ৫৪, ৯৪, ৯৫
প্রবাসী	
পৌষ ১৩৩৪	১৫-১৬, ২০-২১, ২৩
মাঘ ১৩৩৪	২৫-২৬, ৩০-৩২, ৩৪ ৩৬-৩৭
চৈত্র ১৩৩৪	৪০, ৪২, ৬৮, ৭৭, ৭৯, ৮৭
বৈশাখ ১৩৩৫	৪৩, ৮৮-৯১
বর্তমান	
বৈশাখ ১৩৫৪	৯২
নবমঞ্জরী	
১৯৪৫ (?)	৯৩

৩৪, ৪৩ ও ৯১ -সংখ্যক পত্র, শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় -সম্পাদিত রচনাসংগ্রহ নবমঞ্জরীতে (১৯৪৫ ?) পুনর্মুদ্রিত হয়; ৯৩-সংখ্যক পত্রও ঐ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৬-সংখ্যক পত্র ১৩৫৩ শারদীয় সংখ্যা হিন্দুস্থান

পত্রে এবং ৯৪-সংখ্যক পত্র ১৩৫৫ শারদীয় সংখ্যা হিন্দু পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। অধিকাংশ মূলপত্র রক্ষিত হইয়াছে, তদনুযায়ী মুদ্রিত; ১, ৩০, ৩১, ৯২ ও ৯৪ -সংখ্যক পত্র সুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক রক্ষিত প্রতিলিপি অনুযায়ী মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে যে চিঠিগুলি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় তাহার কোনো-কোনোটিতে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, কোনো-কোনোটির অংশবিশেষ পরিবর্জিত হইয়াছিল; এই গ্রন্থে সেগুলি মূলানুযায়ী মুদ্রিত হইয়াছে।

নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত পত্রাবলী ১৩৪৮ সালের শারদীয় সংখ্যা দেশ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। মূল চিঠি সবগুলিই রক্ষিত হইয়াছে ও তদনুযায়ী এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত পত্রাবলী

পত্র ২। পৃ ৫। 'সাকার নিরাকার···লইয়া বাদবিবাদ করিতে চাহি না।'

কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত ১৫-সংখ্যক ৪ জুলাই ১৯১০ তারিখের পত্রে (পৃ ২৭-৩৩) ও ৩০-সংখ্যক ২২ মে ১৯১২ তারিখের পত্রে (পৃ ৫৬-৫৮) এ বিষয়ে আরও আলোচনা আছে। কৌতূহলী পাঠক রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলিও পড়িতে পারেন: 'সাকার ও নিরাকার', আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯; 'নিরাকার উপাসনা', আধুনিক সাহিত্য, পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯; গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯, পৃ ৫৫৯-৬০; 'রূপ ও অরূপ', সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮।

পত্র ৫। পৃ ১১। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর (৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪) প্রসঙ্গ এই পত্রে উল্লিখিত।

পত্র ৫। পৃ ১১। 'কন্যাতুইটি'। পত্র ৬। পৃ ১২। 'বর্ত্তমান তুই কন্যা'। জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা ও কনিষ্ঠা কন্যা মীরা। ইতিপূর্বে মধ্যমা কন্যা রেণুকার মৃত্যু (১৯০৩) হয়।

পত্র ৯। পৃ ১৯। মোহিত বাবু=মোহিতচন্দ্র সেন।

পত্র ১০। পৃ ২১। 'বোলপুরে বালক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়াছি।' ১৩১৫ (১৯০৮) সালের পূজাবকাশের পর অল্প কয়েকজন ছাত্রী লইয়া বালিকা-বিভাগ প্রবর্তিত হয়। এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের পূর্বতন অধ্যাপক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩১ চৈত্র ১৩১৫ তারিখের পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

বিদ্যালয়টি বেশ পূর্ণ হয়ে এসেছে ক্রমে এর পাশে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট্ট চারা আপনিই গজিয়ে উঠেছে এবং হু হু করে সেটি বেড়ে ওঠবার মতলব করচে। অনেক দিন থেকে মনে ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভয়ে এগইনি— ঠাকুর যখন আপনিই ঘরে এসেছেন পূজা না করে ত আর নিষ্কৃতি নেই।[১] এই বালিকা-বিভাগ এ সময়ে দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, তুই বৎসর চলিয়াছিল।

পত্র ১৫। পৃ ৩২। ২-৫ ছত্রে বর্ণিত অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে এরূপ বিদ্ধ করিয়াছিল যে দীর্ঘকাল পরেও ইহা তিনি বিবৃত করিয়াছেন; ১৩৩৯ সালে শান্তিনিকেতনে ৭ পৌষ উৎসবে তিনি প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয়ের উল্লেখ করেন—

আমি এক সময় পদ্মাতীরে নৌকোয় ছিলেম। একদিন আমার কানে এল, একজন বিদেশী রুগ্‌ণ হয়ে শীতের মধ্যে তিন দিন নদীর ধারে পড়ে আছে। তখন কোনো একটা যোগ ছিল। সেই মুমূর্ষুর ঠিক

১ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র-সংগ্রহ, 'স্মৃতি', পৃ ৭৬।

পাশ দিয়েই শত শত পুণ্যকামী বিশেষ স্থানে জলে ডুব দিয়ে শুচি হবার জন্য চলেছে। তাদের মধ্যে কেউ পীড়িত মানুষকে ছুঁল না। সেই অজ্ঞাতকুলশীল পীড়িত মানুষের সামান্য মাত্র সেবা করলে তারা অশুচি হত, শুচি হবে জলে ডুব দিয়ে।...

একজন প্রাচীন অধ্যাপক আমাকে বললেন, তাঁর গ্রামের পথে ধূলিশায়ী আমাশয় রোগে-পীড়িত একজন বিদেশী পথিককে তিনি হাটের টিনের চালার নীচে স্থান দিতে অনুরোধ করেছিলেন। যার সেই চালা সে বললে, পারব না। তিনিও লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করলেন যে, তিনিও সমাজের দণ্ডের ভয়েই তাকে আশ্রয় দিতে পারেন নি। অর্থাৎ মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যসাধন শাস্তির যোগ্য। তিনি হোমিওপ্যাথি জানতেন, পথের ধারেই তাকে কিছু ওষুধপত্র দিয়েছিলেন। আরোগ্যের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় রাত্রে **শিলাবৃষ্টি** হল ; পরদিন সকালে দেখা গেল, সে মরে পড়ে আছে। পাপপুণ্যের বিচার এতবড়ো বীভৎসতায় এসে ঠেকেছে।[১]

—৭ পৌষ ১৩৩৯

পত্র ২২, ২৪-৩০। ১৩১৮ (১৯১১) সাল হইতে রবীন্দ্রনাথের বিদেশ-যাত্রার কয়েকবার প্রস্তাব হয়, নানা কারণে কয়েকবার সে প্রস্তাব স্থগিত থাকে, অবশেষে ১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৯১২ মে) তিনি বিলাতযাত্রা করেন। এই প্রসঙ্গ এই কয়খানি চিঠিতে উল্লিখিত।

পত্র ৩৭। পৃ ৬৯। 'কলিকাতার সভায় বক্তৃতা'। বঙ্গীয়-হিতসাধন-মণ্ডলীর উদ্‌বোধন-সভায় বক্তৃতা, 'কর্মযজ্ঞ', রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪।

পত্র ৬২। পৃ ৯৩। নির্ঝরিণী=নির্ঝরিণী সরকার।

পত্র ৭৬। পৃ ১০৬। মণিলাল=মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

১ কালান্তর, 'নবযুগ'।

পত্র ৭৭, ৭৯। ১৯২১ জুলাইতে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ-ভ্রমণান্তে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধী -প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন দেশের চিত্তকে অধিকার করিয়াছে; রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারেন নাই,[১] ফলে তাঁহার অনেক অনুরাগীর মনও বিচলিত হয়। এই কালে কবি দেশচর্যা সম্বন্ধে যে-সকল মতামত প্রকাশ করেন, কাদম্বিনী দেবী সেই প্রসঙ্গে কবির সহিত পত্রব্যবহার করিয়া থাকিবেন।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভা বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে মৌলানা হজরত মোহানী, স্বরাজের অর্থ 'বিদেশীর নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা'[২] ("complete independence free from all foreign control") এইরূপে ব্যাখ্যাত হউক, এই প্রস্তাব করেন। ইহা গৃহীত হয় নাই, মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। পরে *Young India* পত্রে তিনি লেখেন—

Maulana Hasrat Mohani put up a plucky fight for independence on the Congress platform and then as President of the Muslim League and was happily each time defeated. There is no mistake about the meaning of the Maulana. He wants to sever all connection with

১ দ্রষ্টব্য, কালান্তর, 'সত্যের আহ্বান' ও 'শিক্ষার মিলন'।

২ অবশেষে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯২৭) অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং লাহোর অধিবেশনে (১৯২৯) কংগ্রেসের 'ক্রীড' পরিবর্তিত হইয়া 'পূর্ণ স্বাধীনতা' কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। এখানে তাহার বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক।

the British people even as partners and equals and even though the Khilafat question be satisfactorily solved. It will not do to urge that the Khilafat question can never be solved without complete independence. We are discussing merely the theory. It is common cause that if the Khilafat question cannot be solved without complete independence, i.e., if the British people retain hostile attitude towards the aspirations of the Islamic world, there is nothing left for us to do but to insist upon complete independence. India cannot afford to give Britain even her moral support and must do without Britain's support, moral and material, if she cannot be induced to be friendly to the Islamic world.

But assuming that Great Britain alters her attitude, as I know she will when India is strong, it will be religiously unlawful for us to insist on independence. For it will be vindictive and petulant. It would amount to a denial of God, for the refusal will then be based upon the assumption that the British people are not capable of response to the God in man. Such a position is untenable for both a believing Musalman and a believing Hindu.

India's greatest glory will consist not in regarding Englishmen as her implacable enemies fit only to be turned out of India at the first opportunity but in turning

them into friends and partners in a new commonwealth of nations in the place of an Empire based upon exploitation of the weaker or undeveloped nations and races of the earth and therefore finally upon force.[১]

—*Young India*, Volume iv, No. i, January 5, 1922; p. 4.

পত্র ৮২। পৃ ১১৩। বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার ও বিশ্বভারতীর সুহৃদ্‌বর্গের সহিত যোগরক্ষার জন্য ১৩২৯ সালে কলিকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হয়, এই পত্রের প্রথমে সেই বিষয় উল্লিখিত। এই সম্মিলনীর অনেক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় রচনা পাঠ করিয়াছেন।

পত্র ৯১। পৃ ১২৪। 'সরসীবাবু কবিতাকে যেদিক থেকে যাচাই করতে চান'।

অল-ইণ্ডিয়া সায়ান্স কংগ্রেসে পঠিত "A Peculiarity in the Imagery in Dr Rabindranath Tagore's Poems" প্রবন্ধে[২] রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশেষত্বের আলোচনা করেন—"সে বিশেষত্বটি এই যে, তাঁহার অনেক কবিতাতেই প্রথমে তাল, পরে গান ও তাহার পর গতির ইঙ্গিত পর পর আছে।"[৩] এই প্রসঙ্গে বর্তমান পত্র লিখিত।

সরসীলাল সরকার মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে অপিচ লিখিয়াছিলেন—"যে বাণী রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার ভিতর তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে এক অখণ্ড তাৎপর্য-গ্রন্থনের সূত্রস্বরূপে রহিয়াছে, সে বাণী

১ নির্মলকুমার বসুর সৌজন্যে

২ *The Calcutta Review*, 1928

৩ সরসীলাল সরকার, 'রবীন্দ্র-কাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা'।

শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।…এই মন্ত্র…অবচেতনার ভিতর দিয়া কবির রচনায় তাল, গান ও গতির ভিতর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে… ।

এই প্রসঙ্গে কবির সহিত লেখকের সাক্ষাতে যে আলোচনা হয়, ১৩৩৫ আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে অনিলকুমার বসু "রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ" নামে তাহা লিপিবদ্ধ করেন।[১] নিম্নে তাহা অংশতঃ উদ্‌ধৃত হইল—

সরসীবাবু॥ আর একটা জিনিস আছে যাকে symbolism বলে। উপনিষদের শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ মন্ত্র আপনার লেখার মধ্যে যেন symbolism হয়েছে এ কথা কি আপনি অস্বীকার করেন ? Symbolism অর্থে যেমন মনে করুন যুদ্ধক্ষেত্রের flag (নিশান)। নিশান একটা কাষ্ঠফলকে জড়ানো বস্ত্রখণ্ড মাত্র। কিন্তু যে সৈনিকেরা যুদ্ধ করে তারা তো একে সেভাবে নেয় না। তারা মনে করে এটাই তাদের দেশের সম্মান ও স্বাধীনতার প্রতীক। সেইজন্য মৃত্যু অনিবার্য জেনেও তারা পতাকা ধরে রাখতে ভীত হয় না। মহাত্মা গান্ধীর চরকা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যেতে পারে। চরকার যে কোনো economic value নেই একথা আপনি সবুজ পত্রে লিখে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী দেশের সম্মুখে এই চরকা তাঁর economic সমস্যা সমাধান হিসাবে উপস্থাপিত করেন নি ; বিদেশী বর্জন ক'রে দেশী দ্রব্য ব্যবহার করব, দেশের দরিদ্র শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখাব, এই সকলের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাল গান ও গতি, যাহা

১ সাইকো অ্যানালিসিস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত এই আলোচনায়, ও সরসীলাল সরকারকে লিখিত ২৪ আশ্বিন ১৩৩৮ তারিখের একখানি পত্রে ('সাইকো-এনালিসিস', বিচিত্রা, পৌষ ১৩৩৮) লিপিবদ্ধ আছে।

'মানসী'তে'[১] প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের বক্তব্য, সেগুলি কি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ মন্ত্রের প্রতীক (symbol) স্বরূপ আপনার মনের মধ্যে নাই ?

কবি ॥ তোমার ব্যাখ্যা যে সম্ভব হতে পারে তা আমি অস্বীকার করি না। উপনিষদের এই মন্ত্র আমারও জীবনের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র নিয়ে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় বহুবার অনেক কথাই লিখেছি। সুতরাং ইহার আভাস যে আমার কবিতাগুলির মধ্যেও থাকবে তা কিছুই বিচিত্র নয়। তবে আমি যে সর্বদাই এই মন্ত্র স্মরণ করে লিখে গেছি, এ কথা মনে করলে ভুল করা হবে। Symbolsএর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের লক্ষ্যকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। প্রত্যেক মানুষই তার জীবনে একটা-কিছু লক্ষ্য অথবা উদ্দেশ্য ঠিক করে রাখে, যাকে সে উপলব্ধি করবে। যাহাতে আমরা এই লক্ষ্য ভুলে না যাই, তাকেই সহজভাবে মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা রয়েছে এই symbol সৃষ্টির মধ্যে। জাপানে কচি গাছের ডালকে স্বর্ণের symbol স্বরূপ ব্যবহৃত হতে দেখেছি। কিন্তু জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটির মধ্যেই যদি আমরা এই symbol দেখবার চেষ্টা করি, তা হলে ভুল হবে। symbolকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনের পরিধি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে; এবং সেগুলির মধ্যে symbolকে হয়তো ঠিকভাবে নাও দেখতে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা বলে সেগুলিকে অবান্তর বলে উড়িয়ে দেব না, কারণ তা হলে জীবনের অসীম বৈচিত্র্যকে ভুলে যাওয়া হবে।

পত্র ১। ইহা অনুলিপি হইতে মুদ্রিত ; মূল চিঠিখানি পাওয়া যায় নাই, তাহাতে তারিখ ও স্বাক্ষর ছিল কি না জানা যায় না। এই গ্রন্থে মুদ্রিত

১ 'রবীন্দ্রকাব্যে পরিকল্পনার একটি বিশেষত্ব', মানসী ও মর্ম্মবাণী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪।

কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত পত্রগুচ্ছের মধ্যে ইহাই প্রথম, এই অনুমানে এটিকে প্রথমে বসানো হইয়াছে।

পত্র ১২। মূল পত্রে তারিখ ১৩১৫ কি ১৩১৬ স্পষ্ট বোঝা যায় না, ১৩১৫ হইতে পারে। পূর্বপত্রে (১৩১৬) 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের যেরূপ উল্লেখ আছে তাহাতে এই চিঠিটি ১৩১৬ সালের হইতে পারে, এই অনুমানে ১৩১৬ তারিখ দেওয়া হইয়াছে।

পত্র ২২। ইংরেজি তারিখ ১৭ অক্টোবর স্থলে ২৬ অক্টোবর হইবে।

পত্র ২৭ ও ৩১। ইংরেজি তারিখ পোস্টমার্ক হইতে গৃহীত।

নির্ঝরিণী দেবীকে লিখিত পত্রাবলী

পত্র ১। পৃ ১৩৫। 'ইহা নিশ্চয় মনে রাখিবে, নিজের, বা পরিবারের বা দেশের কাজে ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন না।'

পত্র ২। পৃ ১৩৭। 'তুমি যে দুরূহ প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিয়াছ…।'

পত্র ৩। পৃ ১৩৮। 'এই কথা মনে রেখো, নিজের জন্যেই কি, আর দেশের জন্যেই কি, যা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য তাই একমাত্র সত্য।'

১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে বোমা-নিক্ষেপে দুইজন ইংরেজ মহিলার মৃত্যু ও মানিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কার প্রসঙ্গ এই পত্রগুলিতে উল্লিখিত। এইসকল ঘটনার পর রবীন্দ্রনাথ 'পথ ও পাথেয়' এবং 'সমস্যা' প্রবন্ধে 'ভারতবর্ষের পক্ষে দেশহিত-ব্যাপারটা কি' এবং 'সেই হিতসাধন করিতে হইবে কেমন করিয়া' এই বিষয় আলোচনা করেন, পত্রে 'রাজা প্রজা' গ্রন্থের অন্তর্গত এই দুইটি প্রবন্ধ উল্লিখিত।

পত্র ৩। পৃ ১৩৮। 'আমিও উপনিষদের কোনো কোনো শ্লোককে এইরূপ আশ্রয়ের মত অবলম্বন করে থাকি।'

পত্র ১৫। পৃ ১৫৬। 'এমন কোনো একটি মন্ত্রকে মনের মধ্যে অভ্যাস করে নেবে যেটি স্মরণ হবামাত্র মন একমুহূর্ত্তে সেই সবচেয়ে বড় জায়গায় গিয়ে ঠেক্‌বে।'
এই প্রসঙ্গে, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত এইসকল পত্র উল্লেখযোগ্য—

আমি উপাসনাকালে এবং অন্য সময়েও 'পিতা নোঽসি' এবং 'অসতো মা' এই দুই মন্ত্র বারম্বার উচ্চারণ করিতে থাকি— করিতে করিতে যে পর্যন্ত আমার মন এই দুটি মন্ত্র সম্বন্ধে সজ্ঞান হইয়া না উঠে ততক্ষণ ছাড়ি না। 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌' এ মন্ত্রও অনেক সময় আমার বিশেষ উপকারে আসিয়াছে— কোনো সাংসারিক কারণে মন ক্ষুব্ধ হইলে বা কোনোপ্রকার ক্ষতি বা অনিষ্টের আশঙ্কায় মন উদ্বিগ্ন হইলে শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌ মন্ত্র জপ করিয়া একটি গভীর শান্তি ও মঙ্গলের মধ্যে মন প্রবেশ করে। কখনো কখনো আমি গায়ত্রী মন্ত্রও ধ্যান করিয়া থাকি। …ইতি ১৮ই পৌষ ১৩১৭

—প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৮

…মনটিকে অনন্তের ধারণায় নিবিষ্ট করে রাখতে পারলে আপনিই সমস্ত সহজ হয়ে যায়— মন্ত্রসাধন ছাড়া তার অন্য কোনো পথ আমি ত জানি নে। যখন একটু অবকাশ পাবে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম— শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতং এই মন্ত্রটাকে মনের একেবারে তলা পর্যন্ত গ্রহণ করবার চেষ্টা কোরো— ঐ কথাগুলো যেন তোমার রক্তের সঙ্গে মিশে তোমার নাড়ির মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে। ইতি ৯ই ফাল্গুন ১৩১৭

—প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৮

বিভিন্ন ভাষণে এইসকল মন্ত্র ব্যাখ্যান করিয়াছেন— বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ধর্ম, ও শান্তিনিকেতন ১-১৭ খণ্ড।

বর্তমান গ্রন্থের অন্যত্র মুদ্রিত, কাদম্বিনী দত্তকে লিখিত ৯১-সংখ্যক পত্রের পরিচয় (পৃ ১৮৩-৮৫) এবং ৯২-সংখ্যক পত্রও (পৃ ১২৭) দ্রষ্টব্য।

পত্র ১৮। পৃ ১৬১। 'তোমার মাতার "প্রবাহ" বইখানি।' শ্রীসরলাবালা সরকার -লিখিত কাব্যগ্রন্থ।

পত্র ১৯। পৃ ১৬৩-৬৪। তৃতীয়বার বিদেশযাত্রার (১৯১২) প্রাক্কালে লিখিত পত্র। ডাকঘর রচনার (১৯১১) সময়েও যে এই সুদূরের আহ্বান কবির মনকে ব্যগ্র করিয়াছিল, তাঁহার ডাকঘর-ব্যাখ্যানের (১৩২২) কালীমোহন ঘোষ -কৃত একটি বিবরণে[১] সে কথা বিশেষ করিয়া জানা যায়।

বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থ-ভুক্ত বিলাত-"যাত্রার পূর্বপত্র"।

পত্র ২১। পৃ ১৬৭। 'কাল রবিবারে টাউন হলে আমার সংবর্দ্ধনা'। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা। শ্রীসীতা দেবী -প্রণীত 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে।

১ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ -প্রণীত রবীন্দ্রসংগীত গ্রন্থে 'কয়েকটি তথ্য' অধ্যায়ে মুদ্রিত। 'ডাকঘর' প্রসঙ্গে অপিচ দ্রষ্টব্য *Letters To a Friend* গ্রন্থে মুদ্রিত সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র (৪ জুন ১৯২১)। তাহার অংশবিশেষ উদ্‌ধৃত হইল—

I remember, at the time when I wrote it [*The Post Office*], my own feeling which inspired me to write it. Amal represents the man whose soul has received the call of the open road— he seeks freedom from the enclosure of habits sanctioned by the prudent and from walls of rigid opinion built for him by the respectable.

চিঠিপত্র গ্রন্থমালার পূর্বানুসৃত রীতি অনুযায়ী মূল পত্রের, তদভাবে সাময়িক পত্রের প্রথম মুদ্রণের, পাঠ বানান ইত্যাদি রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এইজন্য গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে বানানপদ্ধতির তারতম্য লক্ষিত হইবে।

চিঠির শীর্ষদেশে বাম দিকে ক্ষুদ্রাক্ষরে যে ইংরেজি তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিঠিতে প্রদত্ত বাংলা তারিখের অনুযায়ী; কতক ক্ষেত্রে পোস্টমার্ক হইতে ঐ তারিখ লওয়া হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে তারিখটি তারকাচিহ্নিত। ঐ চিহ্ন যে স্থলে তারিখের পরে আছে, সে ক্ষেত্রে চিঠি বিলির তারিখ বুঝিতে হইবে; যে ডাকঘর হইতে বিলি হইয়াছে তাহার নামও উল্লিখিত হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে তারিখের পূর্বে তারকাচিহ্ন আছে সে ক্ষেত্রে চিঠি ডাকে দিবার তারিখ বুঝিতে হইবে; ডাকঘরের নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে।

১৯৬১

বর্তমান সংস্করণে সংযোজন: শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত কাদম্বিনী দেবীকে রবীন্দ্রনাথের ১৯ জুন ১৯১৯ তারিখে লিখিত অপ্রকাশিত পত্র। ৭২-সংখ্যক পত্রের তারিখ: বড়োবাজার ২৬ জুলাই ১৯২১।

এ ছাড়াও কতকগুলি মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধিত হইয়াছে।

১৯৯২

মূল্য ৩৩·০০ টাকা